# নরমুণ্ড শিকারের কথা

জয়ন্ত সরকার

# নরমুণ্ড শিকারের কথা

জয়ন্ত সরকার

র‍্যাডিক্যাল
কলকাতা

NARAMUNDA SIKARER KATHA
[About Human Head Hunter]
by
JAYANTA SARKAR

© পূর্বাশা সরকার

অনুমতি ব্যতিরেকে এই বই-এর কোনো অংশের মুদ্রণ ও
পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না।

প্রথম র‍্যাডিক্যাল প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১

অক্ষর বিন্যাস : ঝিল্লি বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক :
গুপ্ত প্রেস
৩৭/৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : প্রণব হাজরা

প্রকাশক
অরুণকুমার দে
র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন
৪৩, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২২৪১ ৬৯৮৮
ই-মেল : radimp60@yahoo.com

ISBN : 978-81-85459-24-0

₹ ৭০

bengaliboi.com

# ভূমিকা

অরুণাচল প্রদেশের তিরাপ জেলার বর্তমান লঙডিঙ সাব-ডিভিশনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মায়নমার ও নাগাল্যান্ডের 'মন' জেলার সীমার সংযোগে ১৯৭৬ সনের ডিসেম্বর মাস থেকে দু'মাসের কিছু বেশি সময় অতীতের নরমুণ্ড শিকারী 'ওয়াঞ্চু' আদিবাসী গ্রাম পাঞ্চাও-এ নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার জন্যে কাটিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এঁদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নরমুণ্ড শিকারের প্রভাব জানার। সেই সময় নরমুণ্ড শিকারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বেশ কিছু ঘটনার কথা এঁদের সংস্কার, এঁদের বিশ্বাস, সমাজের রীতিনীতির মধ্যে অতীতের নরমুণ্ড শিকারের প্রথা কি প্রবলভাবে জড়িয়ে ছিল তা টের পেতে অসুবিধে হয় না। এমনকি সাধারণ শ্রেণীহীন আদিবাসী সমাজের মতো না হয়ে এঁদের সমাজে 'অভিজাত' এবং সাধারণ স্তরের বিভাজন থাকার পিছনেও নরমুণ্ড শিকারের প্রথার গভীর ছাপ লক্ষ্যণীয়। নিজেদের বৈরী গ্রামের মানুষ থেকে সদা সতর্ক থাকা ছাড়াও মাঝে মাঝেই এঁদের সম্মুখিন হ'তে হয়েছে বাইরের জগতের লোকের অনভিপ্রেত কার্যকলাপের। বিশেষত ব্রিটিশ শাসনকালে নানাভাবে প্রশাসনের মানুষের আচার-আচরণে এঁরা বিরক্ত হয়েছেন। সৃষ্টি হয়েছে তীব্র বৈরীতা। সমাজের রীতি অনুসারে যা এঁদের নরমুণ্ড শিকারে প্ররোচিত করেছে।

বর্তমান লেখাটিতে গ্রামের প্রধান 'সম্পা'র বয়ানে ইংরেজ জমানায় নিনু গ্রামে ঘটে যাওয়া এই রকম যে ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটি ভেরিয়র এলউইনের ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত 'India's North-East Frontier in the Nineteenth Century" বইটিতে W.F. Badgley সাহেবের লেখা থেকে নেওয়া। এই সাহেব ঘটনার সময় সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে নিজের মাথাটি অক্ষত রেখে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পাঞ্চাও-এ সি.আর.পি.এফ ক্যাপ্টেনের উদ্ধত আচরণের জন্য যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার সাক্ষী ছিলাম আমরা দু'জন নৃতাত্ত্বিক। এই দু'টি ঘটনা থেকে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে যে কোন কাজে নিযুক্ত সকলেরই এইসব গোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা কতখানি অপরিহার্য।

১৯৭৬-এর প্রথম সমীক্ষার ২৪ বছর পরে ২০০০ সালে অল্প কয়েক দিনের জন্যে দ্বিতীয়বার পাঞ্চাও-এ যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। নব্বই-এর দশক থেকে এই অঞ্চলে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের প্রসার হওয়ার ফলে গ্রামের সর্বত্র বদলের ছাপ নজরে পড়েছে। লক্ষ্য করেছি নরমুণ্ড শিকারের সংস্কার যা অতীতে ছিল গর্ব আর প্রতিপত্তি অর্জনের অঙ্গ, সেটি এখন গ্রামের নতুন প্রজন্মের মধ্যে গর্বের বদলে অপরাধ বোধ জাগিয়ে তুলছে।

এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরাই আবার গ্রামের পরম্পরাগত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ থেকে প্রায় শিকড়হীন হয়ে সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতিতে বাইরের জগতের সংস্কৃতিতে অন্য অনেকের মধ্যে নিজেদের বেমানান মনে করছেন। যার ফলে বাইরের মানুষের প্রতি জন্ম নিচ্ছে হতাশা আর অনেক ক্ষোভ। এই মানসিক টানাপোড়েনের আভাস লেখার মাধ্যমে অন্যত্র তুলে ধরেছি।

নাগা সম্প্রদায় এবং তাঁদের কিছু গোষ্ঠীর নরমুণ্ড শিকারের প্রথা নিয়ে বহু মানুষের অনেক কৌতূহল। এই ধরনের সমাজ সম্বন্ধে নৃতত্ত্বের তত্ত্ব ও তথ্যের জটিল বিষয়গুলিকে কাহিনীর মোড়কে যথাসম্ভব সহজ করে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে 'নরমুণ্ড শিকারের কথা' প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৩ সনে। বইটিতে কিছু জায়গায় অরুণাচলে প্রচলিত অসমীয়া, হিন্দি, বাংলার বহু শব্দের সংমিশ্রণে যে ভাবে কথাবার্তা হয় তা ব্যবহার করা হয়েছে মূলত ঘটনা প্রবাহের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্বন্ধে পাঠককে কিছুটা আঁচ দেওয়ার জন্যে।

বর্তমান মুদ্রণটিতে ক'য়েকটি ছবি সংযোজিত হয়েছে যা ইঙ্গিত করে এঁদের সংস্কৃতির পরম্পরা কিছু ক্ষেত্রে আজও প্রবাহমান।

'র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন'-এর অরুণকুমার দে বইটি নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছেন। তাঁকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

বইটি আমার 'মা'র স্মৃতিতে উৎসর্গ করলাম।

সোদপুর
জানুয়ারি, ২০১১

bengaliboi.com

লালকোট পরিহিত গাঁওবুড়া,
স্ত্রী পরম্পরাগত ঘাস ও
পুঁতির মালার সজ্জায়
(১৯৭৬)

পাঞ্চাওয়ের শম্পা
প্রথমা-স্ত্রীর সঙ্গে (১৯৭৬)

নরমুণ্ড শিকারের নাচ।
(১৯৭৬)

'ওরিয়া'—ফসল কাটার
উৎসবে পুরুষ ও অবিবাহিত
মহিলার নাচ। (১৯৭৬)

বন্দুক হাতে
নরমুণ্ড শিকারির
বেশে (১৯৭৬)

নাচের প্রস্তুতি।
(১৯৭৬)

লঙডিঙ-এ উৎসবে
ওয়াঙচু নাচের
পরম্পরাগত সাজ।
(১৯৭৬)

'মরুঙ'-র নরমুণ্ড রাখার সংস্কৃতি এখন বিলুপ্তপ্রায় (২০০০)

মৃতের উদ্দেশে উৎসর্গ করা মিথুন ও অন্য প্রাণীর খুলি। (২০০০)

ওয়াঙচু শিল্পীর তৈরি নরমুণ্ড শিকারীর প্রতিকৃতি। (২০০০)

বাঁশের আধারে জল-আনা মহিলাদের অন্নতম দৈনন্দিন কাজ।

সৌজন্য ভেরিয়র এলউইন (পঞ্চাশের দশক)

সৌজন্য ভেরিয়র এলউইন
(পঞ্চাশের দশক)

# অর্ধশতক আগে ও পরে

## শিশু নিয়ে স্বচ্ছন্দ ঘোরাফেরা

(২০০০ সাল)

সৌজন্য ভেরিয়র এলউইন
(পঞ্চাশের দশক)

# অর্ধশতক আগে ও পরে

## ঝুম চাষে যাওয়া-আসার নিত্যসঙ্গী নিজেদের তৈরী বেতের কৌণিক টুকরির ব্যবহার

(২০০০ সাল)

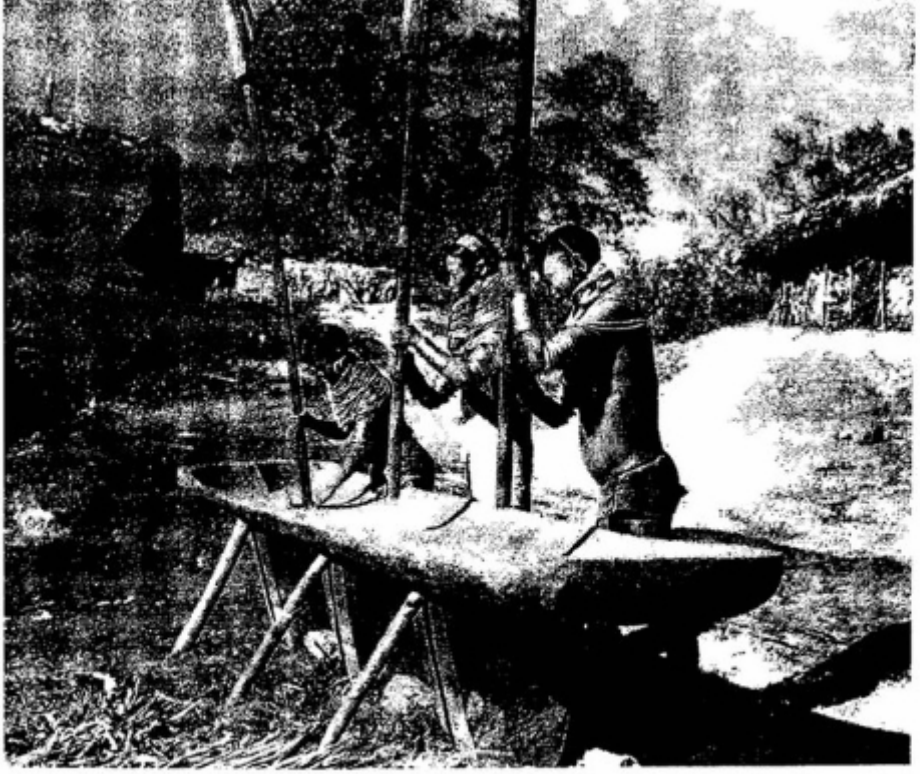

সৌজন্য ভেরিয়র এলউইন (পঞ্চাশের দশক)

# অর্ধশতক আগে ও পরে

মেয়েরাই ধান ভানে

(২০০০ সাল)

'মরুঙ'—অবিবাহিত পুরুষের সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষার কেন্দ্র। (২০০০)

উৎসবের আগে যোদ্ধার পরম্পরাগত সাজ। (২০০০)

যৌবনে প্রবেশের প্রথাগত চিহ্ন উল্কি আঁকায় ব্যস্ত। (২০০০)

পাঙচাও গ্রামের একাংশ।
(২০০০)

টোকা পাতার
ছাউনির গৃহ (২০০০)

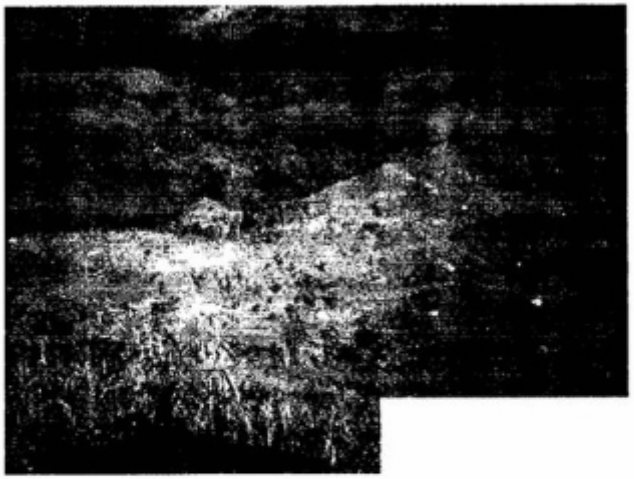

ঝুম চাষের জমি—অতীতে
লড়াই হয়েছে অনেক।
(২০০০)

ঘাস ও পুঁতির মালা বক্ষাবরণের কাজ করে। (১৯৭৬)

পুরুষের কানের
শোভাবর্ধনকারি
শিঙের অলঙ্কার
(২০০০)

বয়স্ক পুরুষ-নারী
এখনও আফিমের ভক্ত (২০০০)

প্রায় এক যুগেরও বেশি পরে অরুণাচলে এলাম। সদিয়া পার হয়ে, ছোট বড় ক'টি নদী পেছনে রেখে গাড়ি চলার রাস্তায় যখন এসে পৌঁছুলাম তখন সূর্যদেব মাথার ঠিক ওপরে উঠে গেছেন।

শীতকালের বেলা। তাই বেশ একটা মিঠে আমেজ রয়েছে অরুণাচলের দুপুরের রোদে।

দূরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে হিমালয়ের ছোট-বড় চূড়া। বরফে ঢাকা চূড়ায় দুপুরের রোদ মাখামাখি হয়ে সাদা আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। অল্পদূরে নিঃসঙ্গের মতো দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েক বছর আগে তৈরি একটি সেতু। এর প্রয়োজনীয়তা এখন আর নেই। পাহাড়ি নদী সেতুর বন্ধনে থাকতে পারেনি বেশিদিন। গতি বদল করে সেতু থেকে বেশ কিছু দূর দিয়ে কলকল করে বয়ে যাচ্ছে মানুষের প্রচেষ্টাকে কিছুটা-বা উপহাস করেই।

গন্তব্য আমার তেজু। লোহিত জেলার প্রশাসনের কেন্দ্র। মনে পড়ে গেল প্রথম এখানে আসার কথা।

সেটাও ছিল শীতকাল। নভেম্বরের শেষে বোধ হয়।

শিলং থেকে যখন অফিসের গাড়িতে রওনা হয়েছিলাম তখনও পর্যন্ত অরুণাচলের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে সেরকম কোন ধারণা ছিল না। শুধু এইটুকুই বুঝেছিলাম নদী-নালা, জঙ্গল পাহাড় বরফ সব মিলিয়ে লোহিত জেলা কোন রকম ভাবেই খুব স্বস্তিতে থাকার মত জায়গা হবে না। সেটা অবশ্য সদিয়াতে আসার পরেই টের পেয়েছিলাম। অফিসের জীপ তুলতে হল ফেরী বোটে। একবার নয় আরো বার দু'য়েক নদী পার হতে হয়েছিল। অবশ্য বোটে নয়, হাঁটু জলের ওপর দিয়ে। শুনেছিলাম বর্ষার সময় মাঝে মাঝে হাতির পিঠে করে এইসব ছোট ছোট নদীগুলো পার হতে হয় বিশেষ প্রয়োজনে। নদীগুলো পার হয়ে আমাদের গাড়ি পাহাড়ি ময়ালের মতো এঁকে বেঁকে পড়ে থাকা রাস্তার ওপর দিয়ে যখন তেজুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন মনের মধ্যে অল্প হলেও কেমন যেন আশঙ্কার ভাব অরুণাচলের আকাশে ভেসে যাওয়া মেঘের মতো ঘোরাফেরা করে যাচ্ছিল।

—স্যার গাড়ি ছেড়ে যাবে। আমার সহকর্মী কাকতির কথায় ফিরে এলাম বর্তমানে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে বাসে গিয়ে উঠলাম।

প্রথমবার যখন এসেছিলাম তখন এখানে কোনরকম বাস সার্ভিস ছিল না। নিজেদের গাড়ি না থাকলে অন্যের গাড়ি বা পথে চলতি লরিই ছিল একমাত্র ভরসা। অবশ্য পায়ে হেঁটে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই ছিল না অরুণাচলে। সন্ধ্যে হওয়ার আগেই তেজু পৌঁছে গেলাম।

এখন আর সেই ছোট্ট তন্বীটি নেই তেজু। ডাগর ডোগর হয়ে বেশ কিছুটা বেড়ে উঠেছে।



bengaliboi.com

গেস্ট হাউসে আমাদের দু'জনের ঘর বুক করাই ছিল। বাস থেকে নেমেই পোর্টারের পিঠে মালপত্র চাপিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম গেস্ট হাউসের দিকে। বেশি দূর যেতে হল না।

সহকর্মী কাকতিকে কেয়ার-টেকারের কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে বাইরে এলাম। মনে করতে চেষ্টা করলাম এই গেস্ট হাউসেই কী প্রথম এসে উঠেছিলাম?

ঠিক বোঝার উপায় নেই।

যতদূর মনে পড়ে সেই সময় যেখানে উঠেছিলাম সেটি ছিল একটি দু'কামরার আসাম টাইপের বাড়ি। ওখানে ওঠার পরে সন্ধ্যেবেলায় আমি আর আমার তখনকার সঙ্গী এখানে মিশমি আদিবাসীদের গাঁওবুড়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

শীতের রাতে গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, মাথায় টুপি পরে পাহাড়ি অন্ধকারের ঘেরাটোপ টর্চের আলোয় হঠিয়ে যখন গাঁওবুড়ার বাড়ি পৌঁছেছিলাম তখনো পর্যন্ত এদের সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণাই ছিল না। যাই হোক, মাটি থেকে অল্প উঁচুতে কাঠের মাচার ওপরে লম্বা কাঠের ঘরে মাথা নিচু করে ঢুকে দেখলাম ঘরের মধ্যে কাঠের আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে। অন্য কোন আলো নেই। তবু সব কিছু দেখতে তেমন কোন অসুবিধে হল না। গাঁওবুড়ার ঘরের এই অবস্থা দেখে বোধ হয় একটু হতাশ-ই হয়েছিলাম।

আমাদের দেখে আধশোয়া অবস্থায় থাকা পুরুষটি উঠে বসল। গায়ে লাল রঙের ফতুয়ার মতো কোট গাঁওবুড়ার চিহ্ন। কোমর থেকে নেমে এসেছে সুন্দর লাল হলুদ আর কালো সুতোর কাজ করা লেংটির মতো একটু কাপড়।

আমরা 'জয়হিন্দ' বলে হাত জোড় করলাম।

বহক্। আমাদের বসতে বলে এবারে ভাল করে উঠে বসল।

মনে হল বেশ বয়স হয়েছে। আগুনের অন্যদিকে বসে থাকা অল্প বয়সী একটি মেয়ে ততক্ষণে বাঁশের বেশ বড়সড় দু'টি গ্লাস আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অল্প একটু হাসল।

গাঁওবুড়া বলল—নাও। ওর নিজের হাতের তৈরি চি।

মিলেট থেকে ঘরে তৈরি মিশমিদের চিতে চুমুক দিয়ে নৃতাত্ত্বিক হিসেবে অরুণাচলে আমার প্রথম কাজ শুরু করলাম। পরে কথাচ্ছলে গাঁওবুড়া বলেছিল যে মেয়েটি আমাদের চি দিয়েছিল, সে গাঁওবুড়ার তের নম্বর স্ত্রী। কথাটা বেশ গর্বের সঙ্গে বলেছিল আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার অনভ্যস্ত মন প্রথমে বিশ্বাসই করতে চায় নি কথাটা। পরে অবশ্য জেনেছি, শুধু এই গাঁওবুড়াই নয়, মিশমিদের অনেকেই একের বেশি স্ত্রী নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করে চলেছেন।

—স্যার খাওয়ার কথা বলে দিলাম।

কখন যেন কাকতি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে টের-ই পাই নি। আমার এই এক রোগ। থেকে থেকেই পুরানো দিনে ফিরে যেতে বেশ ভালো লাগে। কাকতির দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে?

ও মাথা নেড়ে জানালো—হ্যাঁ। পরে বলল—দাসবাবুর বাড়িতে যাবেন বলেছিলেন, এখন কি যাবেন?



bengaliboi.com

—চল। ঘুরেই আসে। বললাম আমি। কতকাল পরে দেখা হবে ভাবতেই কেমন লাগছে।

দাসমশাইও আমার মতো নৃতাত্ত্বিক। সারা জীবন আমাদের শিলঙ অফিসে থেকে কাজ করে কয়েক বছর হল অবসর নিয়েছেন। এখন মেয়ের কর্মস্থল তেজুতে রয়েছেন। অন্য পাঁচজন সাধারণ অসমীয়াদের মতই চেহারা। মানুষ হিসেবে অসাধারণ বন্ধুবৎসল। সদাই হাসিখুশি। নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। অরুণাচলে বিভিন্ন সময়ে নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় আমার সঙ্গে থেকেছেন।

ইচ্ছে করেই খবর না দিয়ে গেলাম চমকে দেওয়ার জন্যে। কলিংবেলের আওয়াজ শুনে দরজা খুলে যে মেয়েটি দাঁড়াল আন্দাজ করলাম এই দাসবাবুর মেয়ে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ডেওটা আছে নাকি?

আছে। বলল মেয়েটি। আমাদের ঘরে বসতে বলে দাসবাবুকে ডাকতে ভেতরে চলে গেল।

আমাকে কেমন যেন ছেলেমানুষি ভাব পেয়ে বসল। বেশ একটু মজাই পাচ্ছিলাম দাসবাবুকে হঠাৎ করে এইভাবে চমকে দেওয়ার সুযোগ পেয়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দাসবাবু পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে প্রথমে একটু চেনার চেষ্টা করলেন বোধ হয় আমাকে। একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কাকতির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। পরক্ষণেই চিনতে পেরে আন্তরিকভাবে উচ্ছল হয়ে উঠলেন। অবাক হয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন—উঃ, কতদিন পরে দেখা। ভাবতেই পারছি না আপনি তেজুতে আসবেন। কোন খবর দেন নি কেন? কোথায় উঠেছেন? ওনার উচ্ছ্বাস দেখে অল্প একটু হেসে বললাম—আপনার এতগুলো প্রশ্নের কোনটার জবাব আগে দিই বলুন তো?

আমার কথায় কান না দিয়ে হাঁকডাক শুরু করলেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন—দেখ চিনতে পার কিনা।

দাসবাবুর স্ত্রী ততক্ষণে নিশ্চয়-ই জেনে গেছেন আমার পরিচয়। তাই একটু অল্প হেসে বললেন— কিয় চিনি না পায়। চেহারাটু অলপ বেয়া (খারাপ) হোল।

বললাম—আপনি কিন্তু একই রকম আছেন। চিনতে অসুবিধা হয় না।

আমার কথায় খুশিই হলেন। বললেন—বহক্।

দাসবাবু বোধ হয় আনন্দে এতক্ষণ আমাদের বসতে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। ব্যস্ত হয়ে বললেন—বসুন।

কাকতিকে বললেন—বহক্।

ছিমছাম সাজানো ঘর। দেওয়ালের মাঝখানে লাগানো রয়েছে ছোট ছোট দুটি বর্শা। নাগাদের বর্শার মডেল। আর একদিকে একটি লম্বা ক্যালেন্ডার। সোফায় বসলাম। সেন্টার টেবিলের ওপরে তাম্বুল রাখার অসমীয়া পাত্র।

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম দাসবাবুর চেহারায় বয়সের ছাপ। মাথার চুল বেশ পাতলা হয়ে গেছে। চোখের পাশের চামড়ায় অল্প ভাঁজও পড়েছে।

—আপনার খবর সবর কেনেকা, ভাল? দাসবাবু আমার সঙ্গে বাংলায় কথা বললেও আমি কিন্তু আমার নিজস্ব অসমীয়াতে ওনার কুশল জিজ্ঞাসা করলাম।



bengaliboi.com

আমার প্রশ্নে হেসে ফেললেন দাসবাবু। বললেন আপনি দেখছি এখনো 'নেফামিশ' ভোলেন নি।

ভোলা কি যায়? আপনিই বলুন। জীবনের একটা বর্ণময় সময়-ই তো আপনি আর আমি 'নেফার' একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়ালাম। কত পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে গিয়ে আদিবাসীদের গ্রামে দু'তিন মাস থাকলাম। তাদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করলাম। রাতের পর রাত 'পনুম' নাচে অনভ্যস্ত পায়ে ওদের সঙ্গে ছন্দ মেলাতে চেষ্টা করলাম। পাহাড়ের ওপরে জঙ্গলের মধ্যে এদিকে ওদিকে কাঠের ধোঁয়ায় ভরা আগুনের আলো-আঁধারিতে নৃত্যাঙ্গনাদের হাত ধরাধরি করে তাদের-ই একজন হওয়ার চেষ্টায় ক্লান্ত শরীরকেও 'আপঙ' খেয়ে সতেজ করলাম।

সমতলের মানুষ থেকে বলতে গেলে প্রায় বিচ্ছিন্ন এইসব আদিবাসীদের আপ্যায়ন, ভালবাসা, কখনো কখনো বিরক্তি বা রাগ চেষ্টা করলেও কী ভুলতে পারা যায়?

আপনিও নিশ্চয়-ই পারেন নি ভুলতে। আমি তো 'অরুণাচলের' কথা উঠলেই কেমন যেন নস্টালজিয়ায় ভুগি। যদি ইচ্ছাপূরণের উপায় থাকতো, তা হলে আবার সেই দিনগুলো ফিরে পেতে অবশ্যই চাইতাম।

—আপনার নিশ্চয়-ই মনে আছে যখন অরুণাচলে আমাদের কেউ কাজ করতে চাইছিল না, তখন আপনি আর আমিই প্রথম এগিয়ে আসি। পুরানো দিনের কথা মনে করাতে চাইলেন দাসবাবু।

—মনে সবই আছে। তখন অবশ্য 'অরুণাচল' নাম হয় নি। তখন ছিল 'নেফা'।

—যাই বলুন আমার কিন্তু 'অরুণাচল' নামটার থেকে আগের 'নেফা' নামটাই বেশি পছন্দ। বললেন দাসবাবু।

একটু অবাক-ই লাগল। এত ভাল একটা নাম ওনার পছন্দ নয়। আগে কখনো কিন্তু কথাটা ওনার কাছে শুনি নি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? এত সুন্দর নামটা পছন্দ নয় কেন?

দাসবাবু একটু হাসলেন। বললেন চিন্তা করে দেখুন বাহাত্তর সালে যখন আপনি আর আমি নেফায় কাজ করা ঠিক করলাম তখন কিন্তু পরিচিতদের কেউ খুশি হয় নি। 'নেফা' নামটার মধ্যেই যেন লুকিয়ে ছিল কেমন একটা অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ। অজস্র পাহাড়ি নদী, কতকাল ধরে বেড়ে ওঠা, কত নাম না জানা পুরানো গাছের গভীর জঙ্গল, সূর্যের আলোও যেখানে সবসময় জঙ্গল ভেদ করে নিচে পৌঁছতে পারে না। জঙ্গলের সঙ্গে আবার বরফ ঘেরা নানান জায়গা, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আর সবার ওপরে সমতলের মানুষের থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা বিভিন্ন সংস্কৃতির আদিবাসী। চিন্তা করলেই কেমন যেন রোমাঞ্চকর মনে হয়। সে জায়গায় অরুণাচল নামের মধ্যে কেমন যেন কাব্যিক কাব্যিক ভাব। আপনার আমার মতো যারা এখানে মাসের পর মাস থেকেছে, বর্ষার ভয়ঙ্কর রূপ দেখেছে, নদীর উন্মত্ততা দেখেছে, বা পাহাড়ে ধ্বস নামায় দিনের পর দিন কোন এক তিন-চারটি ঘরের আদিবাসী গ্রামে রেশনের অভাবে তাদের দেওয়া শুধু স্মোকট্ মিথুনের মাংস খেয়ে কাটিয়েছে, তাদের কাছে মনে হয় 'নেফা' নামটাই বেশ।



bengaliboi.com

কিন্তু এইসবের মধ্যেও আপনি যখন সন্ধ্যের পরে এদের সঙ্গে 'আপঙ' খেয়ে এদের গান গেয়ে ওঠেন, এরা যখন এদের 'মসুপ' (bachelor's dormitory) থেকে আদর করে জোর করে নিয়ে গিয়ে আপনার হাত বা কোমর জড়িয়ে 'আবাঙ'-এর সঙ্গে সঙ্গে 'পনুম' নাচ নেচে ওঠে তখন আপনার মনে হয় না এদের নানা রকম বেঁচে থাকার লড়াই-এর মধ্যে কেমন করে যেন এরা কাব্যের ছোঁয়া ধরে রেখেছে।

কথার মধ্যেই দাসবাবুর স্ত্রী চা-বিস্কুট-মিষ্টি নিয়ে এসে বললেন—এতদিন পরে দেখা হল, কোথায় ছেলে-মেয়ের সংসারের খোঁজখবর নেবে তা না আপনাদের সেই অ্যানথ্রপলজি আর ট্যুরের গল্প। কাকতির অবস্থা দেখুন। কেমন চুপ করে আছে।

সত্যিই, এতক্ষণে খেয়াল হল আশপাশের সব ভুলে আমরা যেন পিছনের দিনগুলোকে আঁকড়ে ধরে আনন্দ পেতে চাইছিলাম। কাকতির দিকে তাকিয়ে বললাম—সরি। তবে তোমরা তো লাইনেই আছ। একদিন আমাদের মতো তোমরাও গল্প করবে। তারপরে দাসবাবুর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম—সত্যি, আমরা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি। ওনাকে কিছুটা খুশি করার জন্যেই বললাম। যখন অফিসের পুরানো কলিগদের সঙ্গে দেখা হয়, তখন-ই এইসব কথা কোথা থেকে আপনা-আপনিই যেন এসে পড়ে। আসলে কি জানেন ম্যাডাম—আমরা সমাজের যে সব মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশা করি তাদের সমাজ ব্যবস্থা আর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যা আমাদের অনেককেই সারাটা জীবন আকর্ষণ করে। এই যে আমি আপনার মিস্টারকে বলছিলাম অরুণাচলের আদিবাসীদের জীবনের মধ্যে কোথায় যেন কাব্যের ছোঁয়া সব সময় অনুভূত হয় তা কিন্তু একেবারে কথার কথা নয়।

কাব্যটাব্য বুঝি না মশাই। আমার কিন্তু এখনো মনে হয় 'নেফার' রোমাঞ্চই আমাদের বারবার টানে। আপনার 'পাঙচাও'-এর কথা নিশ্চয়-ই মনে আছে। কথার মধ্যে হঠাৎই জিজ্ঞাসা করলেন দাসবাবু। ঐ গ্রামে আমাদের ক্যাম্প করার কথাও আশা করি ভুলে যান নি। ওখানে যা ঘটেছিল তা কী কাব্যের ধারে কাছে আসে? দাসবাবুর কথায় মুহূর্তের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ১৯৭৬ সালে।

যতদূর মনে পড়ছে মাসটা ছিল ডিসেম্বর। আমি আর দাসবাবু, সঙ্গে পিওন কালু। নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালানোর জন্যে ওয়াঞ্চু আদিবাসীদের মধ্যে থাকবো বলে বেরিয়ে পড়েছিলাম শিলঙ থেকে। মোট তিন মাসের ট্যুর। অরুণাচলের তিরাপ জেলায় যেতে হবে আমাদের।

নিয়ম মতো প্রয়োজনীয় 'ইনার লাইন' পারমিট শিলঙ থেকেই নিয়ে নিয়েছিলাম। যখনকার কথা বলছি তখন অরুণাচলের মধ্যে তুলনামূলকভাবে তিরাপ জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশ ভাল ছিল। আপার আসামের নাহারকাটিয়া থেকে বাস ধরে তিরাপের প্রশাসনিক হেডকোয়ার্টার খনসাতে গিয়ে পৌঁছলাম বেলা থাকতে থাকতে।

থাকার ব্যবস্থা করার জন্যে আগেই অফিস থেকে অনুরোধ এসেছিল। খোঁজখবর নিয়ে জানলাম 'ট্র্যানজিট' ক্যাম্প'-এর একটি ঘর আমাদের জন্যে রাখা হয়েছে। সমস্ত জিনিসপত্র রেখে দাসবাবু এবং আমি বেরিয়ে গেলাম কীভাবে এবং কত তাড়াতাড়ি ওয়াঞ্চুদের গ্রামে পৌঁছতে পারি তার খোঁজ নিতে।

খনসাও পাহাড়ি এলাকা। পাহাড়ের মাঝে মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বেশ কিছু



bengaliboi.com

বাড়ি। সবগুলিই আসাম টাইপের কাঠ, কঞ্চি, বাঁশ আর করগেট টিন দিয়ে তৈরি। এগুলো কিন্তু সবই সরকারি কর্মচারিদের, এর মধ্যে অফিস, স্কুল, হেলথ সেন্টারও আছে।

এরা কেউই এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নয়। রাস্তার ওপরে 'ট্র্যানজিট' ক্যাম্পের ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা 'নকতে' আদিবাসীদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট গ্রাম।

ওয়াঞ্চুদের মত এদের মধ্যে চীফ (Chief) প্রথার এককালে বেশ প্রবলভাবেই চল ছিল। পরে এদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব পড়ে। বেশ কিছু নকতে বৈষ্ণব ধর্ম নেয়।

আমাদের এই যাত্রায় যেহেতু ওয়াঞ্চুদের মধ্যে মাস তিনেক থাকতে হবে, তাই আর 'নকতে'দের নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে খোঁজ নিতে গেলাম ওয়াঞ্চুদের বিষয়ে। তিরাপ থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে 'লঙডিঙ' বলে একটা জায়গা আছে। সেইখান থেকে আরো পূবে পাঞ্চাও বা ওয়াক্কা সার্কেল-এ বেশ কিছু ওয়াঞ্চু গ্রাম আছে। এদের মধ্যে বর্তমান মায়নমার-এর ঠিক সীমার কাছে পাহাড়ের ওপর একটি বেশ বড়সড় গ্রাম। নাম তার পাঞ্চাও। গ্রামের গা দিয়ে চলে গেছে দু'দেশের সীমারেখা, আর একপাশে নাগাল্যান্ড-এর তুয়েনসাঙ জেলা।

গ্রামের এই ধরনের ভৌগোলিক অবস্থান কাজের পক্ষে উপযুক্ত হবে বলে আমরা পাঞ্চাও যাওয়া মনস্থ করলাম। কিন্তু যাবো বললেই তো আর যাওয়া যায় না। এর নাম নেফা। পদে পদে যদি দুর্গমতা টের না পাওয়া যায় তাহলে কিসের অ্যাডভেঞ্চার? খনসা থেকে লঙডিঙ হয়ে পাঞ্চাও যাওয়ার জন্য সেই সময় একটি কাঁচা রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল কেবলমাত্র জীপ বা ছোট ছোট ম্যাটাডোরের মত গাড়ি যাওয়ার জন্যে।

গাড়ি যাওয়ার রাস্তা থাকাতেই আমাদের হল অসুবিধা। এর আগে লোহিত, সিয়াঙ বা সুবনশিরি জেলার এমন অনেক জায়গাতেই গিয়েছি যেখানে পায়ে চলা পাহাড়ি 'পোর্টার ট্র্যাক' ছাড়া কিছু নেই।

এই রকম জায়গায় কোন অসুবিধে হয় না। জিনিসপত্র নিয়ে 'পোর্টারের' পিঠে চাপিয়ে সারাদিন হাঁটা ছাড়া কোন কষ্ট নেই। পছন্দমত গ্রামে পৌঁছনোর জন্যে কখনো দু'দিন, কখনো বা চার-পাঁচদিন হাঁটাটা কোন ব্যাপার-ই নয়। সারাদিন হাঁটার পর কোন ঝরনার বা পাহাড়ি নদীর ধারে বাঁশের তৈরি রাত কাটানোর জায়গায় আশ্রয়। দু'দিকে সুউচ্চ পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে কলকল করে বয়ে যাওয়া নদীর বরফ শীতল জলে পা ডুবিয়ে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার মতো মনোরম উপায় ভুলিয়ে দিত অন্য সব রকমের কষ্ট। রাত্রে গরম গরম খিচুড়ি শীতে অমৃত সমান মনে হত। শুধু কষ্টিপাথরের মতো গভীর কালো অন্ধকারের মধ্যে কত বিচিত্র পোকামাকড়ের অর্কেস্ট্রার আওয়াজ যখন ধীরে ধীরে স্লিপিঙ ব্যাগের বাইরে বেরিয়ে থাকা কানের মধ্যে দিয়ে মরমে পৌঁছত তখন কিন্তু গা শিরশির করে উঠতো। এই বিশাল পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে আমরা দুই বা তিন জন ছাড়া আমাদের সঙ্গে তিন বা চারজন তল্পিবাহক।

এদের অবশ্য এই পথে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয়। কাজেই তারা নির্বিকার। বাঁশের দরমার ফাটা চেরা দেওয়াল। হাঁটা চলা করতে গেলে পায়ের নিচে বাঁশ মচমচ করে ওঠে। কেঁপে কেঁপে ওঠে ঘরের কাঠামো। এই রকম সময় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদিবাসীদের গ্রামে পৌঁছে যাওয়ার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠতো।



bengaliboi.com

কিন্তু খনসা থেকে পাঙ্চাও হেঁটে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অপেক্ষা করতে হবে কবে কোন দিন এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবে তা ধরার জন্যে। অবশ্য খনসার ডি সি-র অফিসে আমাদের পাঙ্চাও যাওয়ার কথা আগেই জানিয়ে রেখেছি। ওঁদের বিশেষ অনুরোধও করে রেখেছি আমাদের কোন গাড়িতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে।

আমাদের রোজকার কাজ হল সকাল থেকে ট্র্যানজিট ক্যাম্পের জানালায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য রাখা কোন গাড়ি ওপরের দিকে যাচ্ছে নাকি। পালা করে দু'জন সকাল থেকে নজর রাখতাম। মধ্যে একবার ডি সি অফিসে গাড়ির খোঁজ নিতাম। ট্র্যানজিট ক্যাম্পের অন্যান্য ঘরেও অনেকেই রয়েছেন ওপরের দিকে যাওয়ার জন্যে। এঁরা সব অরুণাচলের সরকারি কর্মচারী। তাঁদের কিন্তু আমাদের মতো তেমন তাড়া নেই। উল্টে যত দিন গাড়ির ব্যবস্থা না হয় তত দিনই মঙ্গল। একবার চলে গেলেই তো নির্বাসন।

কিন্তু কোথায় গাড়ি! কোন কাজকর্ম না থাকায় মন মেজাজ বেশ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। চারদিন অপেক্ষা করার পর পাঁচদিনের দিন ডি সি অফিস থেকে জানালো পাঙ্চাও-এর সার্কল অফিসে জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে গাড়ি যাবে। আমরা যেন ঠিক বেলা এগারটা নাগাদ ট্র্যানজিট ক্যাম্পের সামনে তৈরি হয়ে থাকি।

মন থেকে হারিয়ে যাওয়া উৎসাহ এক লহমায় ফিরে এল। যে সব টুকিটাকি জিনিস গোছানোর ছিল সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে রাস্তায় নামলাম। সাড়ে এগারটা নাগাদ এখনকার ম্যাটাডোর সাইজের একটা গাড়ি এল। পিছনটায় ছাউনি দেওয়া খাঁচা। কিন্তু ছাউনি নেই। বেশ কিছু জিনিসপত্রের সঙ্গে বেশ কয়েকজন লোকও আগে থেকেই উঠে আছে।

আমরা তিনজন লটবহর নিয়ে পেছনে উঠে পড়লাম। একেই পাহাড়ি আঁকা-বাঁকা রাস্তা তাই আবার কাঁচা, পেছনে বসারও কোন উপায় নেই। পাহাড়ের প্রতিটি বাঁকে রাস্তার পাশের ঝোপ-জঙ্গলের বেরিয়ে আসা ডালপালা আঁচড় দিয়ে যাচ্ছে গাড়িতে। শরীরের সমস্ত অংশ বেঁকে যাচ্ছে আর ঠিকভাবে সোজা হয়ে থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে কষ্ট হচ্ছে আরও। আমাদের সহযাত্রীরা কিন্তু বেশ অভ্যস্ত বোঝা গেল। বেশিরভাগ এর-ই মধ্যে জায়গা করে বসে পড়েছে।

কতক্ষণ লেগেছিল আজ আর ঠিক মনে নেই। তবে বিকেল গড়িয়ে গিয়েছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সেইদিন সার্কল অফিসার মিঃ মেগার সঙ্গে অফিসে দেখা করতে পারি নি। ওনার কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা করে রাত্রে থাকার মতো একটা বন্দোবস্ত করে ফেলতে পেরেছিলাম।

—কি ভাবছেন? দাসবাবুর প্রশ্নে বর্তমানে ফিরে এলাম। একটু কুণ্ঠিত ভাবেই বললাম—না, আমাদের সেই পাঙ্চাও যাওয়ার দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

দেওয়াল ঘড়ির দিকে নজর পড়তে একটু ব্যস্ত হয়ে কাকতিকে বললাম—দেরি হয়ে গেল বোধ হয়। তাই না?

—না, ঠিক আছে।

—যাই। বলে উঠে দাঁড়ালাম।

পরদিন খাওয়ার নিমন্ত্রণ নিয়ে আস্তানার উদ্দেশে রওনা হলাম।



bengaliboi.com

# দুই

দাসবাবুর ওখান থেকে আসার পরও কিন্তু পাঙচাও-এর চিন্তা ঘুরে ফিরেই আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। মনে পড়ল দ্বিতীয় দিনের কথা।

ভোরবেলায় উঠেই আমি আর দাসবাবু গ্রামের মধ্যে 'চীফ'-এর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে রওনা হলাম। ঝোলায় ভরে নিলাম আমাদের নোট বই আর কলম। এক কিলোর মত চা-পাতার একটি প্যাকেটও ছিল সঙ্গে। এখানে আসার আগেই জেনে এসেছিলাম 'চীফ' যাকে এরা 'সম্পা' বলে, তার অনুমতি ছাড়া ওয়াঙচুদের মধ্যে থাকাতো দূরের কথা, গ্রামের মধ্যে ঢোকাও গর্হিত কাজ। আর সম্পাকে সন্তুষ্ট করার সব থেকে সহজ উপায় হল কিছু উপঢৌকন দেওয়া।

না, কোন সোনা-দানা বা হীরে-জহরত নয়। এদের কাছে অতি প্রিয় উপহার হল চা-পাতা।

এদের মধ্যে আফিম খাওয়ার চল আছে। আফিমের আনুষঙ্গিক হিসেবে লাল চা-ই একমাত্র উপাদেয়। অথচ ভাল চা এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে সহজে পাওয়া যায় না। তাই আমাদের চা-পাতা নেওয়া।

পাঙচাও গ্রামটি পাহাড়ের ঢাল বরাবর ছড়িয়ে রয়েছে। গ্রামে প্রায় দু'শটির মতো ঘর। পাহাড়ের নিচের দিকে অরুণাচলের একটি সার্কল অফিস আর গুটিকয় সরকারি কর্মচারীর ঘর। কোন মতেই জনা পনেরোর বেশি নয়।

গ্রামের উল্টো দিকে সার্কল অফিসের গা ঘেঁসে উঠে গেছে আর একটি পাহাড়। সেখানে আছে সামরিক আর আধা সামরিক বাহিনীর ছাউনি। গ্রামের ঠিক নিচের দিকে সম্পার বাড়ি। যদিও গ্রামের মধ্যে সম্পার আলাদা বাড়ি আছে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়-ই সে গ্রামের নিচের বাড়িতেই থাকে। গ্রামের বাড়িগুলোর পাতার চালা প্রায় মাটির কাছ থেকে উঠে গেছে। ঘরের মধ্যে ঢুকতে হলে একটু নিচু হয়েই ঢুকতে হয়। কোন রকম বাইরের আলো ভিতরে ঢুকতে পারে না বলে ঘরের মধ্যে সারাক্ষণ-ই অন্ধকার হয়ে থাকে।

আমরা সম্পার যে বাড়িতে গেলাম সেটা অবশ্য অন্য রকম। বাড়িটি খুব একটা বড় সড় নয়। পাতার ছাউনিও উঁচু দেওয়াল থেকে উঠে গেছে। ঘরের সামনে সামান্য একটু বারান্দার মত জায়গাও রয়েছে। সম্পার কাছে দোভাষীকে নিয়ে হাজির হলাম। আমাদের পরিচয় দিয়ে এই গ্রামে মাস দু'এক থেকে কাজ করার অনুমতি নিতে।

যদিও এখানে আসার আগে খনসাতে শুনেছিলাম যে এই সম্পা এককালে নিজেই দোভাষীর কাজ করেছে, তবু দোভাষী নিয়ে গেলাম প্রথম পরিচয়টা ভালভাবে করতে। দোভাষীর হাঁক-ডাক শুনে বেরিয়ে এল একটি মহিলা। ছোটখাট শক্তপোক্ত চেহারা, বাদামে রঙ, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। এই চুল ছাঁটার ঢঙ থেকেও এদের মধ্যে কে সম্পার প্রধান স্ত্রী আর কারা প্রধান স্ত্রী নয় তাও নাকি বোঝা যায়। যে মহিলা বেরিয়ে এল সেটি সম্পার প্রধান স্ত্রী নয়। শরীরের ঊর্দ্ধাঙ্গ নিরাবরণ, কিন্তু অনেকগুলো ঘাসের



bengaliboi.com

আর পুঁতির মালা এমনভাবে পরা যে সেগুলোই বক্ষাবরণের কাজ করছে। কোমরের নিচ থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত একটি রঙিন কাপড়ের টুকরো জড়ানো। দোভাষীর সঙ্গে যখন কথা বলল দেখলাম দাঁতগুলো সব মিশমিশে কালো। কানে গোল বড় দুল, হাতে ভারি পেতলের বাজুবন্ধ। হাতে আর পায়ে উল্কির নক্সা।

ওয়াঞ্চু মেয়েরা দাঁত কালো করে সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্যে। বিশেষ কিছু উল্কির নক্সাও মেয়েদের সামাজিক অবস্থান বুঝিয়ে দেয়। মেয়ে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে-ই তার শরীরের বিভিন্ন অংশে উল্কি এঁকে দেওয়া হয়। এই উল্কিই বুঝিয়ে দেয় মেয়ে বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেখে মহিলার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখলাম না। বুঝলাম আমাদের মতো বাইরের লোক মাঝে মাঝেই আসে।

মহিলাটি দোভাষীর সঙ্গে কথা বলে ঘরে ঢুকে গেল। দোভাষীও তার সঙ্গে ঘরে ঢুকে একটি বাঁশের চাটাই নিয়ে এসে আমাদের জন্যে পেতে দিল। বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর থেকে অনেকটা নিচু হয়ে যে বেরিয়ে এল তাকে দেখে বেশ অবাক হলাম। লম্বায় প্রায় ছ'ফুট বা তার কিছুটা বেশিও হতে পারে। শক্তপোক্ত পেটানো গড়ন, গায়ের রঙ তামাটে। শরীরের ওপরের অংশে হাফ হাতা বুক খোলা নক্সা করা নিজেদের হাতে তৈরি রঙিন ফতুয়া। কোমর থেকে নেমে এসেছে সুন্দর কাজ করা লাল-কালো রঙের লেঙটি। ঐরকম লম্বা চেহারার মানুষ শুধু মাত্র লেংটি পরে থাকায় তার সুঠাম পা দু'টো যেন আরো লম্বা লাগছিল। চোখের দু'পাশে উল্কির লম্বা চিহ্ন। কোমর বন্ধে লাগানো রয়েছে কাঠের তৈরি ছোট ছোট ক'টি মানুষের মাথার খুলির প্রতিকৃতি। গুনে দেখলাম চারটি।

ইতিমধ্যে গ্রামের বেশ কিছু নারী পুরুষও আমাদের পাশে জড়ো হয়েছে। বেশিরভাগ পুরুষের শরীরেই কোন রকম আবরণ নেই। প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে সম্পার হাতে চায়ের পাতার প্যাকেটটি তুলে দিয়ে বললাম—তোমার জন্যে শিলঙ থেকে এই সামান্য চা নিয়ে এসেছি। সম্পার চোখ দু'টিতে নরম খুশির ঝিলিক খেলে গেল। বললাম—এই গ্রামে মাস দু'য়েক থেকে ওয়াঞ্চু সমাজ সম্বন্ধে কিছু শেখার চেষ্টা করবো, আর তোমাদের সমাজ নিয়ে একটি বই লিখবো। সঙ্গে অরুণাচলের অন্য একটি সম্প্রদায়ের ওপরে লেখা বইও নিয়ে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা সহজে বোঝানোর জন্যে। বইটি উল্টে-পাল্টে ছবিগুলো দেখে সম্পা বললো—গ্রামে থাকবে কোথায়? ঐ দিকে অফিসের কারো ঘরে থাকো।

বললাম—আমি তো তোমাদের সমাজ সম্বন্ধে জানতে এসেছি। তোমাদের সঙ্গে যদি সবসময় না থাকতে পারি তা হলে শিখবো কী করে?

সম্পা বোধ হয় একটু খুশিই হল। দোভাষীর মাধ্যমে বলল—তোমরা কি গ্রামের মধ্যে থাকতে পারবে?

—কেন পারব না। বললাম আমি।

—তা হলে গ্রামের ভিতরে 'মরুঙ'-এ থাকো।

মরুঙ হল অবিবাহিত যুবকদের রাতে থাকার জায়গা। এখানেই এরা নিজেদের সমাজ সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখতে পারে।



bengaliboi.com

গ্রামে অনেকগুলো মরুঙ আছে। তবে আমার যে আলাদা মরুঙ আছে, চাইলে তোমরা সেখানেও থাকতে পার, বলল সম্পা। রান্নার জন্যে কাঠ, জল বা অন্য যা প্রয়োজন হবে তার ব্যবস্থা মরুঙ-এর ছেলেরাই করে দেবে।

এই সঙ্গে একটু সাবধানও করে দিল সম্পা। বলল—রাত্রে যখন মেয়েরা তাদের মরুঙ থেকে ছেলেদের মরুঙ-এর পাশে যাবে, তোমরা কিন্তু আলাদাই থেকো।

এত সহজেই গ্রামের মধ্যে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় বেশ খুশি হলাম আমি আর দাসবাবু।

সম্পার ভাই-এর তত্ত্বাবধানে বিশাল মরুঙ-এর এক কোণে আমরা আমাদের দু'মাসের জন্যে আস্তানা গাড়লাম। জিনিসপত্র সব ঠিকঠাক করতে করতে চারদিকে একবার আবছা অন্ধকারের মধ্যেও চোখ বুলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম।

তালপাতার মতো এক রকমের পাতার ছাউনির বিশাল হল ঘর। শ'খানেক মানুষ থাকতে পারে অনায়াসে। ঘরের চালা প্রায় মাটি ছুঁয়ে থাকায় ভিতরে সবসময় অন্ধকারে ছাওয়া। তবে মরুঙ-এ ঢোকার দরজাটি বেশ চওড়া আর উঁচু। ফলে কিছুটা আলো ঢুকে সামনেটায় গা ছমছমে আলো আঁধারীর পরিবেশ গড়ে তুলেছে। দরজার ওপর ওয়াঙ্চু শিল্পীর হাতে খোদাই করা মানুষের মূর্তির সঙ্গে মানুষের মাথার কঙ্কালের খোদাই করা প্রতিমূর্তির প্রাধান্যে ভরা বিশাল কাঠের পাটাতন। সামনের দিকের যে জায়গাটুকুতে কিছু আলো পাবো বলে বেছে নিয়েছিলাম, তার অল্প দূরে এক পাশে সার দিয়ে সাজানো রয়েছে মানুষের মাথার খুলি। গুনে দেখলাম উননব্বইটি। 'ট্রফি' হিসেবে সাজানো রয়েছে বলে মনে হল।

আধো অন্ধকার আধো আলোয় উননব্বই জন ওয়াঙ্চু আমাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখছে যেন! দাসবাবু ফিসফিস করে বলে উঠলেন—এ কোথায় এলাম মশাই। এদের সঙ্গে দু'মাস থাকতে হবে। কী জানি দু'মাস পরে হয়তো এগুলো বেড়ে বিরানব্বই হয়ে যাবে। দাসবাবুর চোখ মুখের মতই কালুরও মুখের মধ্যে একটা অজানা আতঙ্কের ছাপ। শখ করে এ ধরনের জায়গায় ঢোকার জন্যে কিছুটা বিরক্তিও মাখানো। দাসবাবুর কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম—কেন, বিরানব্বই হবে কেন?

উনি বললেন—বুঝলেন না, আমাদের তিন জনের মাথাও হয়তো ক'দিন পরে জায়গা পেয়ে যাবে ওদের মধ্যে। কথাটা তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও পরিবেশটাই এমন যে গা ছমছম না করে উপায় নেই। কালু বলে ফেলল—সাব, সার্কল অফিসারকো বাতাকে উধার কাঁহি রহেনেকা জাগা লে লিজিয়ে। আপলোক দিনভর গাঁও মে কাম করেঙ্গে। মুঝে একেলা রহনা হোগা। ওর গলার স্বরে ভয় চুঁইয়ে পড়ছে।

ওকে সাহস দেওয়ার জন্যে বললাম—তুমিও তো আদিবাসী। তোমার গ্রামে যদি 'গাঁওবুড়া' কাউকে থাকতে দেয় তার কী কেউ ক্ষতি করে? না তার কোন রকম ভয় থাকে? সম্পা যখন তার নিজের মরুঙ-এ থাকতে দিয়েছে তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। দেখলে না সম্পার ভাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের সব ব্যবস্থা করে দিল। তাছাড়া আমাদের যা কাজ গ্রামের বাইরে থাকলে তা ঠিক মতো করা সম্ভব নয়। তাকে বুঝিয়ে



bengaliboi.com

সুঝিয়ে স্বস্তি দেওয়ার জন্যে আরো বললাম—ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এরা তো শত্রু ওয়াঙ্চু ছাড়া অন্য কারো মাথা সাধারণত শিকার করতো না।

কালু আমার কথায় আশ্বস্ত হল বলে মনে হল না। কিছুটা মুখ ভার করেই ক্যাম্প খাটগুলো পাততে লাগলো।

মরুঙ-এর একপাশে লম্বালম্বি একটা বিরাট সরু ডিঙ্গি নৌকোর মতো খোদাই করা গাছের বাদ্য যন্ত্র রাখা আছে। প্রতিটি মরুঙ-এই থাকে। পরে দেখেছি এটিকে পনেরো কুড়ি জন যুবক কিভাবে ছোট ছোট কাঠের ডান্ডা দিয়ে বাজায়। এই বাজনার আবার আলাদা আলাদা ধরনও আছে। এক এক ধরনের বাজনার মধ্যে দিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে খবর পাঠানোও হয়।

ঠিক যেমন আমরা অরণ্যদেবের কমিক্স-এ পড়ে থাকি। দাসবাবু কিন্তু মাথার খুলির কথা ভুলতে পারছিলেন না। ও গুলোর দিকে বেশ কিছুটা ভয়ে ভয়েই তাকিয়ে অনেকটা নিজের মনেই বললেন—কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার। মানুষের মাথা কেটে এনে রাখাও আবার সমাজের রীতি হয়। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

—কেন, হিন্দু সমাজে আগে তো কাপালিকরা নর বলি দিতেন বলে জানি। যদিও তাঁরা নিজের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার জন্যে এটা করতেন। নর বলি দিয়ে ইষ্টদেবতাকে তুষ্ট করা যায় বলে বিশ্বাস করতেন, বললাম আমি।

দাসবাবু উঠে মাথার খুলিগুলোকে কাছ থেকে দেখতে দেখতে বললেন—এরা তো আর কাপালিক নয়। কাকে তুষ্ট করার জন্যে এভাবে মাথা কেটে নিয়ে এসেছে কে জানে।

কাজের সময় এটা জানার-ও চেষ্টা নিশ্চয়-ই করবো আমরা। বললাম আমি। তবে এ সম্বন্ধে বই পড়ে মোটামুটি কিছুটা ধারণা হয়েছে।

—তাহলে কাজ শুরু করার আগে শুনে রাখি কারণটা—বললেন দাসবাবু।

—শুধু ওয়াঙ্চুরাই নয়, নাগা সম্প্রদায়ের অনেক গোষ্ঠীই, যেমন আংগামী, রেংমা, আও, কোনিয়াক এককালে নরমুণ্ড শিকার করতো। এরা বিশ্বাস করতো, হয়তো বা এখনো করে যদি এইভাবে 'শত্রু' গ্রাম থেকে মানুষের মাথা কেটে আনা যায়, তা হলে মাটি খুব সুফলা হয়ে ওঠে আর নিজেদের সমাজও সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে যায়। এছাড়া যে মাথা শিকার করে আনতে পারতো তার সমাজে সম্মান প্রতিপত্তিও বেড়ে যেত। প্রতিটি গ্রামের বেশ কিছু আত্মীয় বা 'বন্ধু' গ্রাম আছে। আবার কিছু 'শত্রু' গ্রামও আছে।

একটা মজার ব্যাপার হল এদের সম্পার তার প্রথমা স্ত্রীকে কিন্তু এই রকম কোন 'শত্রু' গ্রামের সম্পার পরিবার থেকেই তুলে নিয়ে আসা নিয়ম। তাদের ছেলেই পরে সম্পা হতে পারে।

এই যে এখানের সম্পা, সেও কিন্তু অতীতে বেশ কটি মাথা শিকার করেছে।

কী করে বুঝলেন? জিজ্ঞাসা করলেন দাসবাবু।

এটা বোঝা এমন কিছু কঠিন নয়। সম্পার চোখের কোণের উল্কির দাগ আর কোমরে ঝোলানো কাঠের তৈরি মাথার খুলিগুলো দেখে সহজেই বোঝা যায়। যারা মানুষের মাথা শিকার করে নি, তাদের এগুলো থাকে না।



bengaliboi.com

মানুষের মাথা শিকারের এই রীতি ফসলের প্রচুর ফলন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর জঙ্গলে শিকারের বাড়বাড়ন্ত হওয়ায় সাহায্য করে বলেও বিশ্বাস করা হত। মনে করা হত অন্য 'শত্রুগ্রাম' থেকে মানুষের মাথা শিকার করে নিয়ে এলে তার আত্মার শক্তিও সেই মাথার সঙ্গে চলে আসে। সেই শক্তি আবার মাথা শিকার যে গ্রামের মানুষ করেছে, তাদের গ্রামের শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

—মাথা শিকার করার এটাই কী একমাত্র কারণ ছিল?

আবার প্রশ্ন করলেন দাসবাবু।

—একমাত্র কারণ না হলেও এই বিশ্বাস যে তাদের বেশ ভালভাবেই ছিল সে বিষয়ে কিন্তু বিশেষজ্ঞদের কোন সংশয় নেই।

—এই বিশ্বাস যদি এখনো থাকে তাহলে দাদা আর এখানে কাজ করে দরকার নেই। পৈত্রিক মাথাটা নিয়ে অন্য জায়গায় পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কিছুটা রসিকতার সুরে কথাটা বললেও দাসবাবুর গলায় প্রচ্ছন্ন একটা আশঙ্কার রেশ রয়েছে বুঝতে অসুবিধে হয় না। বললাম—'ট্রাডিশন ডাই হার্ড' কথাটা মিথ্যে নয়। কাজেই এদের এই বিশ্বাস একেবারে নির্মূল না হওয়াই স্বাভাবিক। দেখছেন না এদের 'মরুঙ'-এর দরজায় বা মানুষের শরীরে এখনো মাথার খুলির আকৃতির ছড়াছড়ি রয়েছে। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। একবার যখন এদের 'সম্পার' অনুমতি নিয়ে গ্রামে থাকতে পেয়েছি, তখন এদের সমাজের পক্ষে খুব কোন বাজে কাজ না করলে রাজ অতিথির মর্যাদাই পাবো। এটাতো বলেছি এককালের এই মানুষের মাথা শিকারিরা কিন্তু বন্ধু বলে যে গ্রাম বা গ্রামের মানুষদের মেনে নিত তাদের কোন প্রকার অনিষ্ট করতো না। তবে যদি কোনভাবে সম্পাকে অবজ্ঞা বা অবমাননা করা হয় এরা তা শত্রুতার নামান্তর বলেই মনে করে। সেক্ষেত্রে যে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন তা দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না।

## তিন

আমাদের 'মরুঙ'-এ আসার কথা ততক্ষণে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। সকলেরই ঊর্দ্ধাঙ্গ নিরাবরণ। কয়েক জনের কোমর থেকে নক্সা করা লেঙটি ঝুলছে। খুবই সুন্দর লাল-কালো রঙের মিশেল। এদের মধ্যে একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলেকে বুশ শার্ট আর প্যান্ট পরা দেখে বেশ অবাক লাগল।

ছেলেটি নিঃসঙ্কোচে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। ওকে কালুর পাতা ক্যাম্প খাটে বসতে বললাম। ও আমাদের অল্প-স্বল্প হিন্দিতে বলল—শুনলাম তোমরা আমাদের গ্রামে দু'মাসের মত থাকবে। আমাদের গ্রামের মানুষদের ব্যাপার তো দেখছো। এখনো পর্যন্ত জামা-কাপড়-ই ঠিক মত পরতে শিখল না। ওর কথায় মনে হল ও বোধ হয় গ্রামের বাইরে চলে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি কী গ্রামে থাকো না?

—না। আমি ফৌজে আছি। এখন জম্মুতে আছি। আমার নাম ওয়াঙনু।

কথাটা শুনে সত্যি সত্যিই খুব আশ্চর্য হলাম। অরুণাচলের এই এরকম একটি গ্রাম থেকে ও আর্মিতে কী করে গেল জানতে ইচ্ছে করল। জিজ্ঞাসাও করলাম।



bengaliboi.com

বলল—একবার 'লঙডিঙে' আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম পাঁচ-ছ বছর আগে। ওখানেই ফৌজে লোক নেওয়ার কথা জেনে সোজা চলে যাই। আমাকে ওরা নিয়েও নেয়। ফৌজে গিয়ে দেখছি দেশের অন্য জায়গার থেকে আমরা সবদিক দিয়ে কোথায় পড়ে আছি। আমার গ্রামের ছেলেদের কত বুঝিয়েছি, একটু লেখাপড়া শিখতে। জামা-প্যান্ট পরতে, আফিম খাওয়ার নেশা ছাড়তে। ওরা আমার কথা গ্রাহ্য ত করেই না উল্টে আমাকে কেমন যেন একটু এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। গ্রামে আমার সেই না ঘরকা না ঘাটকার অবস্থা। ছেলেটির কথার মধ্যে কেমন লজ্জা আর খেদ মিশে আছে।

এতক্ষণ খেয়াল করিনি। আমাদের কথার মধ্যেই বেশ কিছু ছেলে মরুঙ-এ ঢুকে একটু দূরত্ব রেখে রান্নাবান্নার সরঞ্জামের দিকে কৌতূহল ভরা চোখে তাকিয়ে আছে।

ওয়াঙনু ওদের মধ্যে একজনকে কাছে ডাকল। কুড়ি-বাইশ বছরের যুবক। সারা শরীরে খালি একটি লেংটি পরা। হাত পায়ের পেশি দেখলেই অনুমান করা যায় শরীরে বেশ ভালই শক্তি ধরে। ঋজু দেহ। কাছে আসতেই সামনের ক্যাম্প খাটটা দেখিয়ে বসতে বললাম।

ওয়াঙনু পরিচয় করিয়ে দিল—এই মরুঙ-এর ওয়াঙনাওলি। এর-ই দেখ ভালে এই মরুঙ-এর ছেলেরা থাকে। এর অবশ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে একজন। ওকে এখানে এখন দেখছি না। এসে যাবে নিশ্চয়ই। এরাই তোমাদের দেখাশোনা করবে।

মরুঙ-এর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকটি মেয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল।

ওদের চুলের বিভিন্ন রকমের ছাঁট দেখে ইয়ার্কি করেই ওয়াঙনুকে বললাম—

—তোমাদের এখানে মেয়েদের তো বেশ স্টাইল আছে দেখছি। কত রকমের চুল কেটেছে।

ইয়ার্কি ঠিক বুজতে পারল না ও। তাই আমার ভুল ভেঙে দেওয়ার জন্যে বলল—এই রকম চুল কাটাই আমাদের রীতি। চুলের ছাঁট দেখেই বুঝতে পারবে কোন মেয়ে কোন জাতের?

বেশ কিছুটা অবাক হয়ে বললাম—তোমাদের আবার জাতটাত আছে নাকি?

ও আমাদের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে বলল—তোমরা তো গ্রামে দু'মাস কাজ করবে। সবই জানতে পারবে।

আমাদের চারটে ভাগ আছে। ওয়াঙহাম, ওয়াঙপান, ওয়াঙসা আর ওয়াঙসু।

আশ্বস্ত হলাম। তাহলে জাতটাত নয়।

—ঐ যে দেখছো প্রায় ন্যাড়া মাথা ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা চুলের মেয়েগুলো, ওরা সব ওয়াঙপান। যাদের লম্বা এক বিনুনি চুলের ওপরে পাতার ঢাকনা রয়েছে ওদের বাবা হয় ওয়াঙসা বা ওয়াঙসু।

—ব্যাপারটা কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে। বললাম আমি।

—তাহলে আরো একটু মজার কথা বলি। বলল ওয়াঙনু।

—আমাদের ওয়াঙহাম পরিবারের ছেলেরা যখন ওয়াঙপান মেয়ে বিয়ে করে আর তাদের ছেলে মেয়ে হয় তখন কিন্তু তারা ওয়াঙহাম বা ওয়াঙপান হয় না।



bengaliboi.com

—তা হলে কী হয়? তথ্যের সন্ধান পেয়ে উৎসাহ ভরে জিজ্ঞাসা করলাম।

—এই রকম ছেলে মেয়েরা ওয়াঙসা হয়। শুধু যখন সম্পার পরিবারের ছেলে 'শক্র' কোন গ্রাম থেকে ওয়াঙহাম মেয়েকে নিয়ে এসে বিয়ে করে, তখন তাদের ছেলেমেয়েরা ওয়াঙহাম হয়।

—কে ওয়াঙহাম আর কে ওয়াঙপান ছেলে বুঝব কেমন করে?

ওয়াঙ্নু মাথা নেড়ে হাসল।

বলল বোঝা যায়। ঐ যে ওয়াঙনাওলি বসে আছে, ওর হাঁটুর নিচে দেখ পুঁতির একটি মালা বাঁধা রয়েছে। ওটাই বুঝিয়ে দেয় ওর বাবা আর মা দু'জনেই ওয়াঙহাম।

—মেয়েদের কী এরকম কিছু আছে? আরো প্রশ্ন করি।

—নিশ্চয়-ই। না থাকলে তো মুশকিল হবে। বলল ওয়াঙ্নু। ওয়াঙহাম ছেলেরা যেমন পায়ে মালাটা বেঁধে রাখে, সেই রকম একটি পুঁতির বাজুবন্ধ পরে মেয়েরা।

একটি ব্যাপারে কিন্তু আমরা সবাই এক। ওয়াঙ্নু উৎসাহ ভরে বলল।

আমাদের চারটি ভাগের পুরুষরা কিন্তু জোয়ান হওয়ার আগে পর্যন্ত সবসময় মাথা ন্যাড়া করে। পরে ওয়াঙপান ছাড়া বাকি সবাই চুল লম্বা করে বাঁধে।

অযাচিতভাবে প্রথম দিনেই এই ধরনের তথ্য পেয়ে মনটা বেশ খুশিতে ভরে উঠল। গাঁয়ের মধ্যে থাকার এই সুবিধা। প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ওয়াঙ্নু আর ওয়াঙনাওলিকে দিয়ে, নিজেও একটা ধরালাম।

দাসবাবুও আমাদের সঙ্গ দিলেন।

ওয়াঙ্নু বলল—এই মরুঙটা দেখেছ?

—না। এখনো দেখা হয় নি। চল তোমার সঙ্গে ওয়াঙনাওলিকে নিয়ে একটু দেখে নিই।

—প্রধান দরজার থেকে একটু দূরে বেশ কিছু কাঠের তক্তা আর মোটা গাছের গুঁড়ি রয়েছে। এগুলো ছেলেদের বসার জায়গা। ডানদিক বরাবর একটা যাওয়া-আসার জন্যে খোলা জায়গা। বাঁদিকে বাঁশ দিয়ে অর্দ্ধেক পার্টিশন করা।

—ছেলেদের শোয়ার জায়গা এগুলো। বলল—ওয়াঙনাওলি। প্রত্যেকটা খুপরির আবার একটা করে দরজাও আছে। ঘরের চালের থেকে প্রতিটি ঘরে ঝুলছে বাঁশের ছোট ছোট 'শেল্ফ'। ঘরগুলোর উল্টোদিকে খোলা জায়গায় রয়েছে বিশালাকায় কাঠের বাজনা।

—এটার নাম খাম। এবার বলল ওয়াঙনাওলি। পাশ থেকে মোটা মুগুরের মতো কাঠের একটা খণ্ড নিয়ে ওয়াঙনাওলি খামের ফাঁপা জায়গায় আঘাত করল আস্তে করে। পুরো মরুঙ গমগম করে উঠল।

চমকে উঠে গায়ের লোম খাড়া হওয়ার অবস্থা আমাদের। এর মধ্যেই দেখলাম দু'টি ছেলে কাঠ আর জলের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। কালু ওদের নিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা শুরু করে দিল।

দাসবাবু খিচুড়ি আর আলু ভাজার মেনু বলে আমাদের সঙ্গে গ্রামটা একবার ঘুরে দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন। একটুখানি যাওয়ার পরেই একটি ঘরের সামনে দেখলাম



bengaliboi.com

একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে চিত হয়ে চাটাই-এর ওপর শুয়ে আছে। শরীরে কোন আবরণ নেই। হাত দু'টো টানটান করে ছড়ান। গায়ে রোদ পড়ে চকচক করছে। একজন মহিলা, তার শরীরেও কোমরের নিচে ছোট্ট এক টুকরো কাপড় ছাড়া প্রায় কিছুই নেই। শক্ত করে মেয়েটির মাথাটি ধরে আছে। প্রায় একই রকমের দু'জন মহিলা, মেয়েটির দু'টি পা বেশ জোর দিয়ে চেপে রেখেছে। গলায় প্রচুর ঘাসের আর পুঁতির মালা পরা অন্য একজন মহিলা পেন্সিলের মতো কোন একটা জিনিস দিয়ে মেয়েটির শরীরে নক্সা করছে।

আমরা একটু থমকে দাঁড়ালাম।

ওয়াঙ্গু বলল, উল্কি করা হচ্ছে। মেয়েটির বিয়ের বয়স হয়েছে। উল্কি করে সেটা জানান দেওয়া হচ্ছে। তোমাদের বলছিলাম না—আমাদের কতকগুলো প্রথা কিছুতেই কেউ ছাড়ছে না।

দেখলাম একটা ছোট্ট মাটির পাত্রে ঘন সবুজ তরল পদার্থ রয়েছে। তার মধ্যে পেন্সিলের মতো সরু একটি বাঁশের টুকরো ডোবান। মহিলা ঐ বাঁশের টুকরো দিয়ে আড়াআড়ি আর তার ওপর দিয়ে লম্বালম্বি সবুজ দাগ কাটল।

ওয়াঙ্গুকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম—জঙ্গলের গাছ থেকে এই রঙটি মেয়েরা নিজেরাই তৈরি করে নেয়। সবুজ দাগ কাটা হয়ে যাওয়ার পরে মহিলা তার বাঁ হাতে রাখা সরু একটি পেরেকের মতো ছুঁচোল লোহা এক একটি দাগের ওপরে ধরে ডান হাত দিয়ে ছোট্ট বাঁশের হাতুড়ির মতো জিনিস দিয়ে অসাধারণ মুন্সিয়ানার সঙ্গে আলতোভাবে ঠুকতে লাগল। এক একটি লাইনে যতক্ষণ পর্যন্ত না চামড়া ভেদ করে রক্তের রেখা দেখা যাচ্ছে ততক্ষণ ঠুকঠুক করে পেরেকের আঘাত পড়তেই থাকলো। রক্ত বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মহিলা ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী করে এক চিমটে কালো কয়লার গুঁড়ো নিয়ে ঐ রেখাগুলোর ওপরে ঘষে দিল। মেয়েটির নিশ্চয়ই অসাধারণ যন্ত্রণা হচ্ছিল। কিন্তু সে দেখলাম দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে সেই কষ্ট কোন রকম প্রকাশ করতে দিচ্ছে না। পাশে বসে মহিলারা নানা কথা বলে ওর যন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখতে সাহায্য করছে।

মেয়েটি নিজেও জানে কৈশোর থেকে যৌবনে পৌঁছে জীবন সঙ্গী পেতে গেলে তার এই কষ্টটুকু সহ্য করতেই হবে। এই উল্কিই সে অনেক গর্বের সঙ্গে দেখাতে পারবে।

এদিন আর বেশিক্ষণ ঘুরলাম না। ডেরায় ফিরে এসে অল্প একটু জল গায়ে ঢেলে স্নান করে খাওয়া দাওয়া সেরে এখনো পর্যন্ত যা দেখলাম আর শুনলাম তার রোজনামচা লিখতে বসলাম।

ঘরের মধ্যে সারাক্ষণ অন্ধকার থাকায় বুঝতে পারিনি কখন যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কালু চা এনে সামনে রাখায় হুঁশ হল। এইসব পাহাড়ি জায়গায় বেশ তাড়াতাড়িই প্রায় ঝপ্ করে অন্ধকার নেমে আসে।

অল্পক্ষণ পরেই এক এক করে ছেলেরা জড়ো হতে আরম্ভ করল। কেউ সোজা ঐ কাঠের পাটাতনে গিয়ে বসল। কেউ বা শরীর এলিয়ে দিল।

আরো কিছুক্ষণ পরে ওয়াঙনাওলি এসে ওদের মধ্যে বসল। ওরা কী করে দূর থেকে লক্ষ্য রাখলাম।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর চারজন করে যুবক খাম-এর দু'ধারে সার দিয়ে দাঁড়াল। মুগুরের মতো কাঠের টুকরোগুলো প্রত্যেকে একটা করে তুলে নিল। ওয়াঙনাওলি কী একটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলের হাতের কাঠের টুকরোগুলো তালে তালে ওঠা নামা করতে লাগল। খামের ফাঁপা জায়গায় নির্দিষ্ট ছন্দে বাজনা বেজে উঠল।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সুর করে গানও গেয়ে চলল। গানের সুরে গলা মেলাল সবাই। হাতের ওঠা নামার সঙ্গে সঙ্গে কোমর, পা-ও তালে তালে দুলতে থাকল।

মরুঙের ভিতরে আমাদের কাঠের অল্প আগুনে অন্ধকার যেন আরো জমাট হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। এদের শরীরের সমবেত ছন্দের দোলা কতগুলো ছায়ার ধীর লয়ে নাচের মতো লাগছিল। সমস্ত পরিবেশটাতে গা ছমছম করা ভাব।

আমরা তিনজনেই যেন কোন এক অজানা আতঙ্কের ঘোরে কুঁকড়ে গেলাম।

বেশিক্ষণ এদের বাজনা চলল না। বাজনা থামার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোটরা শুয়ে পড়ল।

যুবকদের মধ্যে দু'চার জন বাইরে বেরিয়ে গেল। পরে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম মরুঙ-এর বাইরে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা অতি সাধারণ ব্যাপার। এর মধ্যে দিয়েই বেছে নেয় পরস্পরের পছন্দের মানুষকে, শিক্ষা পায় যৌন জীবনের।

আমাদের তিন জনের মুখের সব শব্দ যেন শেষ হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে এখনো ঐ খামের হাড় কাঁপানো গম্ভীর শব্দ রিনরিন করছে। চোখের সামনে ছায়াগুলো দুলছে। একবার মনে হল—না, এখানে না থেকে সার্কল অফিসের ঐদিকে থাকলে এই রকম মানসিক কষ্ট পেতে হবে না। পরক্ষণেই আমার নৃতাত্ত্বিক সত্তা বলে উঠল তাহলে এদের জীবনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই চাক্ষুষ করা হয়ে উঠবে না। সব মানসিক অবসাদ ঝেড়ে ফেলে কালুকে বললাম—আমরাও এবার খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি।

## চার

পরদিন সকালে জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম সম্পার সঙ্গে দেখা করতে। উদ্দেশ্য এদের মানুষের মাথা শিকারের প্রথা সম্বন্ধে ভাল করে জানা।

এখানের সম্পা নিজে মাথা শিকার করেছে আর এই ধরনের লড়াই-এও সামিল থেকেছে। কাজেই তার মুখ থেকে শোনা তথ্যের দিক থেকে একটা আলাদা মূল্য আছে।

আজকে আর সঙ্গে দোভাষী নেই। সম্পা নিজেই দোভাষীর কাজ করেছে বেশ কিছুদিন। কাজেই আমরা সোজাসুজিই তার সঙ্গে কথা বলতে পারবো।

সম্পার ঘরের সামনে এসে দাসবাবু হাঁক দিলেন।

—সম্পা বাইরে বেরিয়ে এল।

—আহ্‌ক্ বলে অভ্যর্থনা করল। একজন দুটো কাঠের চৌকো বাক্স এনে আমাদের বসার জায়গা করে দিল।

সম্পা নিজে একটা কাঠের চেয়ারে বসে আমাদের দিকে অল্প ঢুলুঢুলু চোখ মেলে বলল,

—মলঙে (মরুঙ) লরা বিলাক কোন দিকদারি করা নাই ত?



bengaliboi.com

—একো নাই। বললেন দাসবাবু। আমার কারণে হে জাগাটুই ভাল।

আমাদের কথায় সম্পা বোধ হয় একটু খুশিই হল।

বলল—সরকারের কিছু মানু মলঙে থাকিব না পারে।

—কিয়? আমি কথা আগে বাড়ানোর জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম।

—কী জানি। ভয় পাব পারে। বলল সম্পা।

—ভয়র কি আছে? আবার প্রশ্ন করলাম।

—তাতে মাথা বিলাক আছে। রাতি লরা বিলাক নাচ-গান করি থাকে। বাহিরর মানু বুঝি না পায়।

আমরা যে তথ্য জানার উদ্দেশে সম্পার কাছে এসেছি তার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি দেখে বললাম—আপনার মরুঙে অনেক মাথা চালে (দেখলাম)। আপনি কেতিয়াবা (কখনো) মাথা লইছে নাকি?

সেজাসুজি প্রশ্নটা করে একটু অস্বস্তি হল। কী জানি যদি রেগে যায়।

সম্পা আমার প্রশ্নটা শুনে তার কোমরের পিছনে ঝুলে থাকা চারটি কাঠের ছোট মাথায় খুব আদরের সঙ্গে হাত দিল। চোখে মুখে বেশ একটু গর্বের ভাব ফুটে উঠল। রাগের বদলে খুশিই হয়েছে মনে হল।

গলার স্বরে খুশির আমেজ মিশিয়ে বলল—ময় চারিটা মাথা আনিসু। হে কারণে এই গুলা আছে। আরু কে বার মাথা লবলই গাঁওর মানু লগতে গৈসু।

—চারটি মাথা যখন শিকার করেছ আর বার কয়েক শিকারিদের সঙ্গ দিয়েছ তখন তোমার কোন ভয় করে নি?

একেবারে বেফাঁস প্রশ্ন করে ফেললাম।

সম্পা এবার বেশ অসন্তুষ্ট হল। কিছুটা বা বিরক্তি মাখান চোখে আমাকে দেখল। পরে বলল

—ওয়াঙ্চু মতা (পুরুষ) মানু যদি মাথা লবলৈ ভয় পায় তাক্ কুনে চাব? বিয়ার কারণে হে ছোয়ালি (মেয়ে) না পায়। গাঁওর মানুও তাক ছি ছি করিব।

যে মতা মানু মাথা কাটা নাই বা মাথা শিকারত যাওয়া নাই হে ওয়াঙ্চুই ন হয়। ময় যেতিয়া প্রথম মাথা কাটিলু তেতিয়া আমার বয়স উনিশ-বিশ হব।

আমার গাঁয়ের হারাম (চাষের জমি)-এর মাটি লই কাজিয়া আছিল। ইয়ার পরা পূবে এটা গাঁও আছে। আপনি ওয়াঙ্চু দা দেখিছে ন হয়।

—ঘাড় নেড়ে জানালাম এদের দা আমরা দেখেছি।

—গাঁওর বিশ-পঁচিশ জন জোয়ান মানুক সম্পা বদলা লবলৈ পঠাব ঠিক করিলে। গাঁওর গোম্পা(পূজারী) কলপাতা কাটি তাত কী সব করি পেলাই চালে (দেখল)। পিছতে মাথা শিকারের মত দিলে।

এরপর যা বলল তা বাংলায় বলাই ভাল। রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই সবাই ঢাল, বর্শা আর ঘাড়ে বন্দুক নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল। মাথায় ওদের বেতের বোনা টুপি, তাতে শুয়োরের দাঁত, পাখির পালক দিয়ে সাজানো।



bengaliboi.com

—অতদিন আগেও আপনাদের বন্দুক ছিল? কোথায় পেতেন? জিজ্ঞাসা করল দাসবাবু।

—সম্পার কথায় বাধা পড়ল। একটু বিরক্ত হল। তবু বলল—আমরা তো জন্ম থেকেই বন্দুক দেখছি। আমাদের কারিগরেরাই তৈরি করে। নাগাল্যান্ডের মানুষের কাছ থেকেই আমাদের লোকেরা শিখেছে।

—বন্দুকের গুলি কোথা থেকে পান? আবার জিজ্ঞাসা করল দাসবাবু।

—আমাদের তো গাদা বন্দুক। বন্দুকের বারুদ তৈরি করতে আমাদের লোকেরা শিখেছে চান্নুর মানুষের কাছ থেকে।

আমাদের কথার মধ্যেই বাঁশের চোঙায় 'জু' দিয়ে গেল একটি মেয়ে। এরও পরনে কোমর থেকে আটকানো ছোট্ট এক টুকরো কাপড়। কানে দুল আর গলায় অল্প ঘাসের আর পুঁতির মালা। উর্দ্ধাঙ্গ খোলা অবস্থায় আমাদের সামনে আসায় কোন রকম আড়ষ্টতা দেখতে পেলাম না।

ঘরে তৈরি 'জু'তে চুমুক দিয়ে সম্পাকে তার খেই হারিয়ে যাওয়া মাথা শিকারের গল্পের কথা মনে করিয়ে দিলাম। সম্পা বাঁশের চোঙাতে লাগানো কলকেতে আগুন দিয়ে অনেকটা হুঁকোর মতো টান দিল। হুঁকোর মতই গুড়গুড় করে আওয়াজ উঠলো। 'জু' না খেয়ে সম্পা আফিমে টান দিয়ে মৌতাত ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হল আবার। একটু অপেক্ষা করার পরে আবার শুরু করে যা বলল তা হল,

—সবাই সারি দিয়ে পায়ে কোন শব্দ না তুলে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই হারামের শেষ প্রান্তে গিয়ে ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকল। এইখানেই শত্রু গ্রাম থেকে জোর করে জমির দখল নিতে চাইছে। ওরা এই দিকেই আসবে আন্দাজ করে সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল শিকারি চিতার মতো। হালকা কুয়াশা সমস্ত জায়গাটা তখন আবছা করে রেখেছে।

হঠাৎ-ই সামনে যে ছিল তার হাত সম্পার দিকে এগিয়ে দিল একটি পাতা। উত্তেজনায় কেঁপে উঠল ওর শরীর।

শত্রুর দেখা পাওয়ার সংকেত।

হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে গেল কয়েকগুণ। বুকের ধক্ ধক্ শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে তখন।

পিছনে যে ছিল তার হাতে পাতাটি চালান করে দিয়ে চোখের দৃষ্টি সরু করে কুয়াশা ভেদ করে লক্ষ্য রাখল সামনের মানুষের চলা ফেরা। আক্রমণের সামনের সংকেত আর আওয়াজ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিছু দূরে শত্রু গ্রামের তিন চার জন পুরুষ ইতিউতি দেখতে দেখতে জমিতে নামছে দেখা গেল। অপেক্ষার শেষ হল প্রচণ্ড হুঙ্কারে লিডার হো হো করে দা উঁচিয়ে দৌড়নো শুরু করতেই। কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল সবাই।

এবার মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শিকারি চিতার ক্ষিপ্রগতিতে নজর স্থির রেখে সম্পা একটু দূরেই পেয়ে গেল শত্রুদের একজনকে। দানোয় পাওয়া মানুষের মত শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চালিয়ে দিল দা। সকলের উল্লাস আর যুদ্ধ জয়ের চিৎকারের সম্বিত ফিরে পেল সম্পা।

প্রথমবার শিকারে এসেই পেয়েছে একজনের মাথা। অন্যেরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। এখানে এক মুহূর্ত থাকা যুদ্ধের রীতিতে পড়ে না। লিডারের সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি ঝুড়ির মধ্যে ভরে নিল কুড়ি বছরের উঠতি যুবক।

দু'তিন জন মিলে শরীরটা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে গেল। তাদের পিছনে অন্য কয়েকজন পাহারা দিতে দিতে এল। জীবনের প্রথম অসাধারণ সাফল্যের সুখ স্মৃতিতে সম্পার চোখ দুটো আবেশে বুজে গেল। তামাটে মুখ আরো চকচকে হয়ে উঠল।

অতীতের সেদিনে ফিরে গিয়ে উত্তেজনায় চাপা স্বরে বলল—ফেরার সময় প্রায় হাওয়ায় উড়ে উড়ে এলাম। গ্রামে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে যে অভ্যর্থনা পাব তা মনে করেই সবার চলার গতি আরো নিঃশব্দ হয়ে উঠল। গ্রামের সীমানায় ঢোকার মুখেই সকলের হুঙ্কারে ততক্ষণে দলে দলে মানুষ জড়ো হতে আরম্ভ করেছে। মেয়েদের মধ্যেই উৎসাহ যেন আরো বেশি। আমাদের একটু কাছে আসার জন্যে হুড়োহুড়ি। রাতারাতি গ্রামের মধ্যে অন্যের থেকে অনেক আলাদা হয়ে গেলাম। মেয়েরা ভাত, মিথুনের মাংস আর বাঁশের চোঙা ভর্তি 'জু' নিয়ে ভোজ লাগিয়ে দিল। কে আগে তার বাঁশের চোঙা থেকে আমাদের 'জু' ঢেলে দেবে তার জন্যে কাড়াকাড়ি। গ্রামের মানুষের আমাদের মতই তখন গর্ব। গ্রামের সম্মান বেড়ে গেল অনেক।

আমরা শত্রুকে উচিত শিক্ষা দিয়ে এসেছি। ততক্ষণে শিকার করা মানুষটির হাত আর পা দুটো আলাদা আলাদা করে কাটা হয়ে গেছে। সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে সম্পার কাছে প্রথানুযায়ী খবর দিতে গেলাম।

আমার বাবাই তখন সম্পা। তাই আনন্দে আরো উত্তেজনা বেড়ে যাচ্ছে।

জানি ছেলের এই বীরত্ব বাবার বুক গর্বে আরও চওড়া হয়ে উঠবে। সমাজে তার প্রতিপত্তি আরও বাড়বে। ছেলেকে বিয়ের জন্যে মেয়েদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

বাবা তাঁর মরুঙ-এর বাইরে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করতে অপেক্ষা করছিলেন।

আমরা একে একে তাঁর সামনে শিকার করা মানুষটির মাথা, পা আর হাতগুলি নামিয়ে রাখলাম। সেগুলো দেখে বাবার মুখে চোখে আনন্দ যেন ফেটে বের হচ্ছিল। উনি বিজয়ী বীরদের একবার ভাল করে দেখলেন। পরে সকলকে বললেন—তোমারা আমার গর্ব, আমাদের সকলের মুখ উজ্জ্বল করেছ। ভবিষ্যতেও তোমরা এইভাবে সকলের গর্বের কারণ হবে।

বাবা আমাকে আলাদা করে কিছু না বললেও তাঁর চোখ দেখে বুঝলাম অপত্য স্নেহ, পুত্র গর্বে তাঁর বুক আজ টইটম্বুর হয়ে উঠেছে।

এরপর প্রথামত গোম্পাকে ডাকা হল।

গোম্পা মাথা, হাত আর পা গুলো নিয়ে 'ট্রফি' করে রাখার ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।

একটা লম্বা বাঁশ ততক্ষণে একজন কেটে এনেছে। তার একটা দিক চিরে চিরে একটা চুঙির মতো করে ফেলল। তার মধ্যে কাটা হাত পা আর মাথা আটকে বাঁশটাকে গ্রামের এক কোণায় পুঁতে দিল।

গোম্পা ছাড়া সেই দিন থেকে ওটা আর কারুর ছোঁয়া রীতিবিরুদ্ধ।



bengaliboi.com

এর আগে কাটা মাথা থেকে চুল কেটে আমাদের সম্পাকে আর আমরা যারা শিকারে গিয়েছিলাম তাদের দিয়েছিল। এই চুল আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ। গ্রামের সম্পদ। গ্রামের সম্পা আর যারা মাথা শিকারে যোগ দিয়েছে তারা ছাড়া কেউ এগুলো রাখতে পারবে না।

আমরা মাথার টুপিতে সেই চুল লাগিয়ে নিলাম। কানের দুলের সঙ্গেও বেঁধে নিলাম। কেউই আমরা এগুলো হাত ছাড়া করতে চাই না। জীবনের অসাধারণ কীর্তির নিদর্শন চিরকাল রেখে দিতে চাই। একনাগাড়ে বেশ কিছুটা উত্তেজিত হয়েই সম্পা তার জীবনের প্রথম মাথা শিকারের গল্প বলে কিছুটা হাঁপিয়ে পড়ল।

একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তার বাঁশের চোঙে আরাম করে গুড়ুক গুড়ুক করে আবার ক'বার টান দিয়ে সুখের আবেশে চোখ বুজে ফেলল।

আমরা দুজনেই গল্প শুনতে শুনতে কেমন যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

সামনে বসা বৃদ্ধের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ভাবলাম—কী নৃশংস একটা কাজকে এত গর্বের সঙ্গে আজো বুকে ধরে রেখেছে। কী অদ্ভুত রীতি। যা অন্যের কাছে নারকীয়, তাই এদের কাছে সারা জীবনের সাধনার বস্তু। এই মানুষটাই চারজনের মাথা কেটে এনেছে। যোগ দিয়েছে এই রকম আরো বেশ কয়েকবার মাথা শিকারের অভিযানে।

নৃতাত্ত্বিক হিসেবে মনে একটা প্রশ্ন জেগে উঠল। চেপে রাখতে পারলাম না। বললাম—মাথা শিকার কী যৌবনেই শুধু করেছেন?

আমার কথা শুনে সম্পা তার আধ বোঁজা চোখ একটু খুলল। বলল—আমার বাবার পরে আমি যখন গ্রামের সম্পা হলাম তখন থেকে এই রকম শিকারে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

—কেন?

—সম্পা নিজে এরকম শিকারে যায় না। যদি কোনভাবে তার মৃত্যু হয় তাহলে তো গ্রাম অভিভাবক শূন্য হয়ে পড়বে। ছত্রাকার হয়ে যাবে। শত্রু গ্রামে টিকতে দেবে না। তাই পারতপক্ষে সম্পাকে গ্রামের মানুষই এই রকম শিকারে যেতে দেয় না।

—এখনো কী আপনাদের এই রকম শত্রু আর বন্ধু গ্রাম আছে? প্রশ্ন করলেন দাসবাবু।

সম্পা একটু নড়েচড়ে বসল। আমাদের সরকারি কর্মচারী পরিচয়টার জন্যে এই প্রশ্নের জবাবটা ঠিক কীভাবে দেবে সেটা বোধ হয় মনে মনে একটু গুছিয়ে নিল। তারপর বলল—সমাজের এতদিনের রীতি, এত হানাহানি কাটাকাটি হয়েছে যাদের সঙ্গে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কী এত সহজে বদলে যাওয়া সম্ভব।

—এখন তো আর মাথা শিকার হয় না। কিন্তু আমাদের মতো যারা মাথা শিকার করেছে, যারা নিজেদের মানুষের মাথা শিকার হওয়ার দুঃখ পেয়েছে, তারা তো কখনই শত্রুদের ক্ষমা করতে পারবে না। আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের মতো মানুষেরা যখন আর বেঁচে থাকবে না, তখন হয়তো আমাদের সমাজে আর এই শত্রু গ্রাম বলে কিছু থাকবে না।

আফিমের মৌতাতে সম্পার গলার স্বর ঝিমিয়ে পড়েছে মনে হল। নাকি আগামী



bengaliboi.com

দিনের বর্ণহীন টানটান উত্তেজনা ছাড়া সাদামাটা জীবনযাত্রার কথা চিন্তা করে কথাগুলোর মধ্যে বেদনা মিশে তার গলার স্বর ঝিমিয়ে পড়ল ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এতক্ষণ টের পাই নি। বেলা অনেক হয়েছে। রোদে পিঠ চড়চড় করতে আরম্ভ করেছে। 'জু'-এর রেশে শরীরে বেশ একটু চনমনে ভাব এসে গেছে। সম্পার কাছে আজকের মতো বিদায় নিয়ে আমরা ডেরার দিকে রওনা হলাম।

পথে দাসবাবু বললেন—কী বীভৎস ব্যাপার বলুন তো। আমাদের সামনে বসে থাকা মানুষটা চার জনের মাথা নিজে কেটে এনেছে। তার সঙ্গে বসে এতক্ষণ কথা বললাম—ভাবতেই কেমন লাগছে।

ব্যাপারটা যদি অন্যভাবে দেখেন তাহলে কিন্তু সব সহজ হয়ে যায়। বললাম আমি।

—কী রকম? জিজ্ঞাসা করলেন দাসবাবু।

—কিছুদিন আগেও আমাদের সমাজে কেউ যদি বাঘ শিকার করে নিয়ে আসত তাকে দেখার জন্যে রীতিমত ভীড় হয়ে যেত গ্রামে। তাকে সবাই বিশেষ সমীহের চোখে দেখত। তাই নয়? শিকারিকে ঘিরে বীরত্বের নানা কাহিনী গজিয়ে উঠত। শিকারি তার এই কীর্তি চিরকাল ধরে রাখার জন্যে বাঘের ছালের আসন করাতো বা 'স্টাফ' করে বাঘের চেহারাটা ঘরে সাজিয়ে রাখত।

কই তার এই নৃশংস ব্যাপারটা তো আমাদের কাছে ভয়ানক মনে হয় না।

আমার এই রকম তুলনা শুনে দাসবাবু এতটাই অবাক হলেন যে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ প্রায় হাঁ করে আমাকে দেখলেন। পরে বললেন—এ আপনি কী বলছেন? কোথায় মানুষের মাথা আর কোথায় বাঘ শিকার। দুটোকে আপনি এক ভাবে দেখছেন!

—কেন? এমন কী আর তফাত আছে। আগে বাঘ শিকারি হিরো হত, কিন্তু আজকের দিনে যখন আমরা 'ওয়াইল্ড লাইফ' সংরক্ষণ নিয়ে সচেতন হতে শুরু করেছি, তখন এই শিকারিরাই তো আইনের চোখে অপরাধী। আমরাও তাকে খুব একটা ভাল চোখে দেখি না। তাই না? এখানকার মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তো সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মাথা শিকারের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফসলের বেশিবেশি ফলন, গ্রামের মানুষের প্রতি ইষ্টদেবতার আশীর্বাদ ঝরে পড়া, আর তারও উপরে সাধারণ মানুষের কাছে অসাধারণ হয়ে ওঠার আনন্দ।

—এরা এর মধ্যে বীরত্ব খুঁজে পায়, নৃশংসতা নয়।

—আপনার কথা কিছুই বুঝলাম না, হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন দাসবাবু। আমিও আর কথা বাড়ালাম না।

ডেরায় ফিরে খবর পেলাম সার্কল অফিসার মিঃ মেগা আমাদের দুজনকে বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। দাসবাবুকে বললাম—আমিও ভাবছিলাম একবার ওঁর কাছে যাবো। মেগা তো নিশ্চয়ই সুবর্ণশিরি জেলার নিশি সম্প্রদায়ের মানুষ হবেন। অরুণাচলের আর এক প্রান্তের আদিবাসী অফিসার এখানকার মানুষকে কী চোখে দেখেন সেটা জানলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে।



bengaliboi.com

## পাঁচ

বেলা চারটে নাগাদ ঝোলা কাঁধে সার্কল অফিসের উদ্দেশে রওনা হলাম। সার্কল অফিসের লাগোয়াই মিঃ মেগার আস্তানা।

বাইরের বারান্দায় বসেছিলেন মেগা। পরনে প্যান্ট আর বুশ শার্ট। পায়ে চপ্পল। মঙ্গোলয়েড চেহারার টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। চোখ দুটো ছোট। মাথার চুল একটু লম্বা। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন—আহ্‌ক্‌। আহ্‌ক্‌ বহ্‌ক্‌।

সামনের দুটো চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন।

কাঁধের ঝোলা চেয়ারের গায়ে রেখে বসলাম।

—আপনি ইফালে (এদিকে) থাকিলে ভাল্‌ আছিলে। বললেন মেগা। গ্রামে আপনাদের অসুবিধে হবে। আমার এদিকে কোয়ার্টার খালি পড়ে আছে। আপনারা সেখানে থাকতে পারেন।

—অসুবিধে খুব একটা নেই। গ্রামে থাকলে আমাদের পক্ষে অনেক কিছু জানা সহজ হয়। তাই ওখানে থাকাই ঠিক করেছি। বললাম আমি।

—জানি আপনারা গ্রামে থাকতেই পছন্দ করেন। দু'একজন নৃতাত্ত্বিককে আমাদের সুবণশিরি জেলাতে গ্রামে থাকতে দেখেছি। কিন্তু এদের হাল তো নিজের চোখেই দেখছেন। এখনো পর্যন্ত ভাল করে জামা কাপড়-ই পরতে শিখল না। এদের সঙ্গে কী থাকা যায়?

প্রসঙ্গটা একটু ঘোরাবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম।

—আপনি এখানে কতদিন আছেন?

—এক বছরের ওপরে হয়ে গেল। আর ভাল লাগছে না।

আমরা সাকুল্যে পাঁচ-ছ জন অফিসার আছি। আর্মির লোকেদের বা সি আর পি এফ-এর জওয়ানদের সঙ্গে তো আমাদের সিভিলিয়ানদের তেমন ওঠা বসা নেই। একজন বাঙালি ডাক্তার আছেন, আর্মির ক্যাপ্টেন আছেন আর আমি আছি।

গ্রামের মানুষের সঙ্গে তো মেলামেশাই করা যায় না। কী করে দিন কাটে এই রকম জায়গায়। জানি না আপনারা সিয়াঙ বা সুবণশিরি জেলাতে গেছেন কিনা।

অনেক দিন পরে বাইরের মানুষ পেয়ে একাকিত্ব কাটাতে অনেকগুলো কথা গড়গড় করে বলে ফেললেন মেগা।

দাসবাবু সুবণশিরিতে কাজ করেছেন সে কথা জানালেন।

তা হলে তো আপনারা দেখেছেন সেখানের আদিবাসীরা কত অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। আমি নিজে নিশি। আমার মতো অনেকেই লেখাপড়া করেছে। আমাদের মধ্যে মেয়েরাও এখন স্কুল কলেজে যাচ্ছে। বোধ করি কিছুটা গর্বের সঙ্গেই বললেন মেগা। আর এই ওয়াঞ্চুদের দেখুন। সরকার তো অনেক প্রাইমারি স্কুল খুলেছে। এক দু'জন মাস্টার মশাই-ও থাকেন। ছাত্র পাওয়া মুশকিল।

আপনারা কী সেই গল্পটা শুনেছেন? হঠাৎ-ই প্রশ্ন করলেন উনি।

জিজ্ঞাসু চোখে মেগার দিকে তাকালাম। সবেমাত্র একদিন আগে এসেছি। তাও সারাদিন



bengaliboi.com

গ্রামের মধ্যে-ই কাটিয়েছি। এর মধ্যে কী গল্পের কথা বলছেন কেমন করে বুঝব।

আমাদের জিজ্ঞাসু চাউনি দেখে মেগা একটু হাসলেন। ওঁর দু'চোখের পাশের চামড়ার ভাঁজ আরো একটু ঘন হল।

বললেন—এ দিকের কোন একজন মাস্টারমশাই-এর কাছ থেকে শোনা। সত্যি-মিথ্যে জানার কেউ চেষ্টা করে নি। বরং সবাই গল্পটা উপভোগই করে।

—এইসব স্কুলের ছাত্রদের জন্যে 'মিড ডে' টিফিন দেওয়ার চল আছে জানেন নিশ্চয়। একদিন স্কুলের একমাত্র মাস্টারমশাই দেখেন একজন বয়স্ক ওয়াঙ্চু পুরুষ স্কুলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ থেকে। মাস্টারমশাই ওকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন কী দরকার? পুরুষটি কাচুমাচু মুখ করে বলল—আমার ছেলেটার শরীর ভাল নেই। আজ আসতে পারে নি। তার বদলে আমি এসেছি। খাবারটা কখন দেবে?

পুরুষটির কথা শুনে মাস্টারমশাই হাসবেন না কাঁদবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। হাঁ হয়ে গিয়েছিল তাঁর মুখ।

ছেলে স্কুলে আসে, খাবার পায় এটাই জানে। এখানে কী হয় সে ধারণা তার নেই। তাই টিফিনটা পাবে বলে ছেলের বদলে নিজে স্কুলে হাজিরা দিতে এসেছে।

—গল্পটার মধ্যে হয়তো কিছু অতিরঞ্জন আছে। কিন্তু এটাই এখানকার সত্যিকারের পরিস্থিতি। এডুকেশন সম্বন্ধে এদের কোন ধারণা-ই নেই।

এর মধ্যে চা এসে গিয়েছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম—পরম্পরাগত কিছু প্রথা আর বিশ্বাস দূর হতে তো সময় লাগবেই।

—কেন? আমাদের সমাজেরও অনেক প্রথাই তো আমরা এখন আর মানছি না। যেগুলো মানছি সেগুলোও তো বর্তমান পরিস্থিতিতে কিছু রদবদল করে নেওয়া হচ্ছে।

—যেমন ধরুন আদিদের 'মসুপ' মানে ব্যাচেলর ছেলেদের রাতে থাকার জায়গা এখনো রয়েছে গ্রামে গ্রামে। কিন্তু এখন 'মসুপের' ছেলেরা সমাজের নানা রকম সাংস্কৃতিক ট্র্যাডিশনগুলোকে তাদের সমাজের বাইরে তুলে ধরার জন্যে সব সময় চেষ্টা করে যাচ্ছে।

—আর এখানে দেখুন। বাইরের জগৎ নিয়ে কোন চিন্তা ভাবনাই নেই।

—আদিদের মধ্যে যে জিনিসটা হয়েছে তা নিশ্চয়-ই তাদের এডুকেশন আর বাইরের মানুষের বহুদিন ধরে যোগাযোগের ফল এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। বললাম আমি। ওয়াঙ্চুদের পরিস্থিতিটা একটু আলাদা।

—কেন? আলাদা কিসের জন্যে। এরাও তো আমাদের মতই অরুণাচলে রয়েছে। আমার যুক্তি মানতে চাইলেন না মেগা।

—তা আছে। বললাম আমি। কিন্তু এদের এই মাথা শিকারের প্রথাই এদের সব কিছুতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—ঠিক বুঝলাম না। কিছুক্ষণ আগে এখানকার মাস্টারমশাই মিঃ বরুয়া এসেছেন। তিনিই কথাটা বললেন।

—জানেন তো, এই নরমুণ্ড শিকারের প্রথার জন্যেই এদের প্রতিটি গ্রামের এক বা অনেকগুলো 'শত্রু' গ্রাম ছিল। সেই শত্রুতা সংস্কৃতির মধ্যে এমনভাবে ঢুকে আছে যে



bengaliboi.com

একটি গ্রাম তার 'শত্রু' গ্রামের ওপর এখনো আস্থা রাখতে পারে না। এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের কোন রকম সামাজিক যোগাযোগ বা লেনদেন প্রায় নেই-ই।

—এই জন্যেই তো এরা এখনো নিজের গ্রামের মধ্যেই বিয়ে-থা করে তাই না? বললেন দাসবাবু।

—ঠিক। গ্রামের বাইরে গিয়ে বিয়ে করার ঝুঁকি এরা নিতে পারে নি। গ্রামের মধ্যে থেকেই বিয়ের পাত্র-পাত্রী খুঁজে নিতে হয়।

—এটাও কেমন একটা বাজে ব্যাপার বলুন তো। মুখটা অল্প একটু কুঁচকে বললেন মেগা। এতো একরকম নিজেদের মধ্যেই বিয়ে হচ্ছে।

—বায়োলজির দিক থেকে দেখলে নিশ্চয়-ই নিজেদের মধ্যে বিয়ে। কিন্তু ব্যাপারটাকে যাতে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে না মনে হয় তার জন্যে কী সুন্দর একটা সমাধান এদের পূর্বপুরুষরা বের করেছে দেখুন।

—এদের মধ্যে আবার সুন্দর কী দেখলেন জানি না। ঠোঁট ওল্টালেন মেগা।

—আপনারা যাদের রাজা বলেন সেই রাজ পরিবারের পুরুষরা সাধারণ শ্রেণীর মেয়েদের বিয়ে করবে গ্রাম থেকে। মজা দেখুন এদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু রাজ পরিবারভুক্ত হবে না। তারা সমাজে একটা অন্য শ্রেণী তৈরি করবে। এদের ছেলেমেয়ে আর সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েদের কিন্তু বিয়ে হবে। ফলে কি হচ্ছে তিন-চারটি জেনারেশন পরে সাধারণ শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে রাজার শ্রেণীর কোন রকম সম্পর্ক থাকছে বলা যায় না।

—এ সবই কিন্তু নরমুণ্ড শিকারের প্রথার জন্যে হয়েছে। এক গ্রামের সঙ্গে আর এক গ্রামের এই 'শত্রু' মনোভাব যতদিন জিইয়ে থাকবে ততদিন আমাদের মতো সবাই এক হয়ে এদের পক্ষে কিছু করার অসুবিধে আছে।

—তা হলে তো মুশকিল। এই 'শত্রু' মনোভাব খুব সহজে যাবে বলে মনে হয় না। মন্তব্য করলেন দাসবাবু।

—কেন? এবার আমি প্রশ্ন করি।

—প্রতিটি গ্রামেরই কারো না কারো আত্মীয়ের মুণ্ড যদি শিকার হয়ে থাকে তাহলে তো তারা সেই মুণ্ড শিকারি গ্রামের মানুষদের কখনই ক্ষমার চোখে দেখতে পারবে না। গল্পচ্ছলেও যখন দু-তিন জেনারেশন পরের ছেলেমেয়েরা এইরকম ঘটনার কথা শুনবে তখন তারাও নিজের আত্মীয়ের হত্যাকারীদের সহজভাবে নিতে পারবে বলে মনে হয় না।

—তা ঠিক। এর সঙ্গে আর একটা ব্যাপারও বোধ হয় যোগ করা যায়। এদের এই 'রাজার' প্রথাও কিন্তু সাধারণ মানুষকে একে অন্যের কাছাকাছি আসতে দেয় না। আর এখনো পর্যন্ত এদের রাজারা গ্রামে বেশ প্রতিপত্তি রাখে বলেই তো মনে হচ্ছে। কাজেই যতক্ষণ না সব গ্রামের রাজারা একমত হয়ে এদের সংস্কৃতিকে আদিদের মতো সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্যে অল্পস্বল্প রদবদল করে নিচ্ছে, ততক্ষণ সত্যি সত্যিই এগিয়ে যাওয়া কষ্টকর হবে।

—কিন্তু নাগাল্যান্ডের যেসব নাগাদের মধ্যে নরমুণ্ড শিকারের প্রথা ছিল, তারা তো সব



bengaliboi.com

এখন কত প্রগতিশীল হয়ে গেছে। তারা যদি পারে তাহলে এরা পারবে না কেন। আমার যুক্তি খন্ডন করতে চাইলেন মেগা।

—পারবে না তো বলি নি। বলেছি কতগুলো বাধা সহজে দূর করতে পারছে না এরা। আর নাগাল্যান্ডের কথা বলছেন—সেখানেও কিন্তু বহুদিন লেগেছে এই প্রথার প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে। আর আপনারা তো জানেন-ই এটা সম্ভব হয়েছে মিশনারীদের জন্যে। বছরের পর বছরের চেষ্টায় নাগাল্যান্ডের শিক্ষার যা প্রসার হয়েছে তাতো সারা ভারতবর্ষের মানুষই এখন জানে।

সেরকম তো কিছু এদের মধ্যে হয় নি এখনো।

আর এক কাপ চা খেয়ে রোজ একবার দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা আস্তানার উদ্দেশে রওনা হলাম।

## ছয়

আমাদের প্রাথমিক জড়তা প্রায় কেটে গেছে। গ্রামের মধ্যে যে কোন সময়, যে কোন মানুষের সঙ্গে বসে গল্পের ছলে কাজ করার কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

সেদিন সম্পার ছোট ভাইয়ের ঘরে 'ঘরত আছ নাকি' বলে আমরা ঢুকে পড়েছিলাম।

সম্পার ভাই ঘরেই ছিল।

—আহক্ আহক্ বলে সাদর আহ্বান করল। সম্পার মতো অত লম্বা চেহারা নয়। তবে বেশ পেশী বহুল শরীর। মুখে কিন্তু সে রকমের কঠোরতার ভাব নেই। পরনে লেংটি। ঘরের মধ্যে সেই আধা অন্ধকার।

তার মধ্যেই নজরে পড়ল বিশাল ফলাওয়ালা একটি বর্শা দেওয়ালে টাঙানো। সচরাচর এত বড় ফলার বর্শা দেখা যায় না।

কৌতূহল হল। উঠে দাঁড়িয়ে বর্শাটার কাছে গিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। বর্শাটা এমনভাবে দেওয়ালে রাখা আছে যাতে সহজে কেউ হাত না দিতে পারে।

বর্শার মাঝখানটা পালক দিয়ে গোল করে সাজানো। একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম বাঁশের হাতলটা মধ্যিখান থেকে কিছুটা যেন চিরে ফেলা হয়েছে।

কৌতূহল চাপতে না পেরে সম্পার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম।

—এর হাতলটা এ রকম ফালা করা কেন?

সম্পার ভাই একটু হাসল। বলল—আমাদের গ্রামের সব বর্শার হাতল-ই এই রকম।

—সে আবার কী?

—আমাদের গ্রামের এক অসাধারণ লড়াইয়ের গল্প এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। গল্পের গন্ধ পেয়ে ওর কাছে ফিরে এসে ব্যাপারটা জানতে চাইলাম।

ও শুরু করল। এতদিনে নিশ্চয়-ই জেনেছ যে আমাদের বোণীয়া বলে কিছু দূরে একটা গ্রাম আছে। এখান থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে হবে।

প্রায় সব শক্তিশালী ওয়াঞ্চু গ্রামের এই রকম এক দুটো ছোট গ্রাম থাকে। এরা প্রধান



bengaliboi.com

গ্রামের সম্পাকে রীতি অনুযায়ী এখনো সময়ে সময়ে ভেট পাঠিয়ে থাকে। এখন শুধু বোণীয়া আমাদের অধীনে থাকলেও নিয়মিত ভেট কিন্তু লঙফঙ, মিনটঙ, কামহুয়া আর খাঁসা থেকেও আমরা পাই।

এই গ্রামগুলোও হয়তো কোন না কোন সময়ে পাঙচাও-এর সম্পাকে মেনে নিয়েছিল।

আসলে যখন কোন গ্রাম বড় হয়ে যায় তখন তার আশেপাশে তো চাষ-বাস করার আর জমি থাকে না তাই গ্রামের সম্পা তার নিজের লোক ঠিক করে যতখানি সম্ভব কাছাকাছি নতুন একটি গ্রামের পত্তন করে। বোণীয়া কিন্তু এইভাবে হয় নি। এটি রীতিমত লড়াই করে দখল করেছে পাঙচাও-এর মানুষ।

সে গল্পও বেশ রোমাঞ্চকর। পাঙচাও-এর প্রায় প্রতিটি বয়স্ক লোকই এই লড়াইয়ের কথা গর্বভরে বলতে ভালবাসে।

সম্পার ভাই ঘরে বসেই সেই গল্প শোনাল। শ্রোতা আমরা ছাড়াও বেশ কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

ওরা ওদের পূর্বপুরুষের বীরত্বের কাহিনী শুনতে শুনতে কখনো কখনো উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। চোখ বড় বড় হয়ে উঠছিল। এইভাবেই তো সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ঘটনার বিবরণ মুখে মুখে শুনে শুনেই তারাও হয়ে উঠবে তাদের সংস্কৃতির ধারক বাহক।

সম্পার ভাই লড়াই-এর যে গল্প বলল তা অনেকটা এইরকম। আজ থেকে প্রায় আড়াইশ বছর আগে কন্নু গ্রাম থেকে বেশ কিছু মানুষ এখনকার সম্পার পূর্বপুরুষের নেতৃত্বে পাঙচাও নামে নতুন গ্রামের পত্তন করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট পাঙচাও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

শুধুমাত্র পাঙচাও-এর নেতৃত্ব দিয়ে তখনকার সম্পার মন ভরে না।

সম্পার অধীনে দু'চারটে গ্রামই যদি না থাকল তাহলে ওয়াঙচু সমাজে অন্য গ্রামের মানুষ তাকে সম্মান দেবে কেন? ভয়ও পাবে না। ভয়-ই যদি না পায় তাহলে তো যে কোন সময় তারা সদলবলে আক্রমণ করতে পারে। কাজেই পাঙচাও-এর সম্পা গ্রাম দখল করার দিকে মন দিল। এখনকার পাঙচাও গ্রাম থেকে চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে বোণীয়া গ্রামের পাশেই ছিল নিয়াঙগো গ্রাম। নিজের গ্রামের কাছাকাছি একটি অজানা গ্রাম থাকতে দেওয়া কোন সম্পার পক্ষেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যে কোন সময়ে এই গ্রামই হয়তো শত্রুতা করে বসবে।

ঠিক হল এই নিয়াঙগো গ্রামকে হয় দখল করতে হবে, আর না হয় এদের সকলকে গ্রাম শুদ্ধ অন্য কোথাও হটে যেতে বাধ্য করা হবে।

যা ভাবা তাই কাজ।

পাঙচাও-এর সম্পার মরুঙে বসে ঠিক হল নিয়াঙগোর সম্পাকে লড়াই-এ আহ্বান করা হবে। লুকিয়ে চুরিয়ে আক্রমণ নয়। একেবারে সামনা-সামনি লড়াই। দু-গ্রামের লড়াকু মানুষ খোলা মাঠে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

দু'দলের কারো হাতেই কিন্তু কোন বন্দুক ছিল না। পাঙচাও গ্রামের কাছে ছিল একটি মাত্র বর্শা। বিশাল তার লোহার ফলা। বাঁশের হাতলও তুলনায় বেশ বড়।



bengaliboi.com

—এই হল সেই বর্শা। অনেকটা মোহাচ্ছন্নভাবে বর্শাটির কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সম্পার ভাই। প্রায় ফিসফিস করে বলল—চিন্তা করতে পার এই একটামাত্র বর্শা দিয়ে দুটো গ্রামের মানুষ লড়াই করেছে।

—সে আবার কী করে হয়। বিস্ময় চেপে না রাখতে পেরে আমরা সবাই প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলাম।

—সেইটাই হয়েছে।

কথা কটি বলতে বলতে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে অনেকটা স্বগতোক্তি করেই বলল—তোমরা আমাদের তো অসভ্য বর্বর ভাবো।

বাধা দিয়ে বললাম—মোটেই না। নৃতাত্ত্বিকরা কোন মানুষের সমাজ বা তাদের রীতি-নীতি, সংস্কৃতিকে কখনই অসভ্য মনে করে না।

সম্পার ভাইয়ের মুখটি আবছা আলো অন্ধকারে কেমন যেন অভিমানী অভিমানী লাগল। ওকে নিশ্চয়-ই আমাদের মতো বাইরের মানুষের কাছ থেকে সমাজ নিয়ে এমন অনেক কথা শুনতে হয়েছে যা মানসিকভাবে ওকে বেশ ঘা দিয়েছে। ওকে তো পাঙচাও-এর বাইরে খনসা বা তিনসুকিয়া মাঝে মাঝেই যেতে হয়।

মনের গভীরের সেই ক্ষোভ নিজের অজান্তেই ও কিছুটা প্রকাশ করে ফেলেছে।

আমার কথায় ওর আবেগ কিছু কম হল বলে বোঝা গেল না।

আলো-আঁধারিতে ঠিক ঠাহর করতে না পারলেও গলার স্বরে মনে হল বেশ একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বলল

—সবাই তো তোমাদের মতো আমাদের সমাজকে জানার জন্যে দিনের পর দিন পড়ে থাকে না। বেশিরভাগই তো আমাদের মুণ্ডু শিকারি বলে ভয় পায়। যতখানি সম্ভব এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। বাচ্চাগুলোর এই গুরুগম্ভীর কথা পছন্দ হচ্ছিল না। তারা ঐ বর্শার পিছনে লুকিয়ে থাকা গল্প শোনার জন্যে উৎসুক। ওরাই সমস্বরে বলল—লড়াই-এ কী হল বল। ওদের আব্দারে স্বস্তি পেলাম। কেমন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম।

সম্পার ভাই ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল—

নিয়াঙগোদের কাছে কোন হাতিয়ার ছিল না। লড়াইটা হবে কী করে?

আমরা কিছু বলার আগেই বাচ্চারাই অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল—গ্রামে কোন হাতিয়ার ছিল না কেন? এর জবাব অবশ্য ছিল না ওর কাছে। কোনদিন হয়তো এই প্রশ্ন তার মাথাতেও আসে নি। খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে বলল

—সে আমি জানি না। সম্পা ভাল বলতে পারবে।

—ঠিক আছে। কী হল শেষ পর্যন্ত বল। জানতে চাইল বাচ্চারা।

দু'দলের লড়াকুদের মধ্যে একটা শর্ত হল। এই বর্শা দিয়েই লড়াই হবে। এক এক দলের একজন করে বর্শা নিয়ে অন্যদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে মারার জন্যে।

—অদ্ভুত শর্ত। ফিসফিস করে এবার বললেন দাসবাবু।

—শর্ত অনুযায়ী প্রথমে পাঙচাও গ্রামের একজন এই বর্শা দু'হাত দিয়ে মাথার ওপরে তুলে আসুরিক চিৎকার করে দৌড়ে গিয়ে সামনে কিছু দূরে দাঁড়ান অন্য পক্ষের লোকেরা



bengaliboi.com

কোন বাধা দেওয়ার আগেই একজনের বুকে আমূল বিঁধিয়ে দিল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। নিরস্ত্র মানুষটি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এবার ওদের পালা।

মাটিতে পড়ে থাকা শহীদের দেহ থেকে বর্শা বের করে ওদের একজন একই রকম ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে দৌড়ে এল। আমাদের লোকেরা ওর হাতের বর্শা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। বাধা দিল, কিন্তু ওদের যোদ্ধাও কম যায় না।

আমাদের একজন লুটিয়ে পড়ল বর্শার ঘায়ে। এই রকম লড়াই কতক্ষণ চলেছিল জানি না। এক সময় দেখা গেল দু'পক্ষের সব মিলিয়ে একশ জনের ওপরে মানুষ মারা গেছে।

আমাদের পক্ষে ছিল কন্নু গ্রামের মানুষ। নিয়াঙগোর সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না। বোণীয়াও নয়।

ওরা শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করল। ওদের গ্রামের মানুষ আমাদের সম্পাকে ওদেরও সম্পা বলে মেনে নিতে রাজি হয়ে গেল। বোণীয়াও এতে সায় দিল। সমঝোতার কথা শুনে, আমরা যারা গল্পটা শুনছিলাম, সবাই স্বস্তি পেলাম।

এই ধরনের নরহত্যার কথা শুনতে শুনতে মনটা অসাড় হয়ে যাচ্ছিল।

এ কী ধরনের লড়াই-রে বাবা! যদিও গল্পটার মধ্যে অতিরঞ্জনের ভাব বেশ চড়া বুঝতে পারছি, তবু পাছে মনে আঘাত পায় তাই বাচ্চাদের তোলা প্রশ্নটা ইচ্ছে থাকলেও আবার করলাম না। ঘরে ঘরে দা আর বর্শা যাদের, তাদের একটা মাত্র বর্শা নিয়ে লড়তে হল কেন? বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সবটাই কষ্টকল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু এসব কিছু না বলে বললাম—নিয়াঙগোর মানুষ প্রথমেই তোমাদের সম্পাকে মেনে নিলে আর এতগুলো মানুষের জীবন যেত না।

—তা কী করে হয়। বিনা লড়াই-এ অন্যকে রাজা বলে মেনে নিলে শুধু ওরাই নয়, ওদের ছেলেমেয়েরাও তো সমাজে মুখ দেখাতে পারত না। আর সেই জন্যেই অন্যেরা চাইলেও নিয়াঙগোর সম্পা হাঙওয়াঙ আমাদের সম্পাকে মানতে চাইল না। সোজা কথায় জানিয়ে দিল—সে স্বাধীন থাকতে চায়, তার জন্যে যা হবার হবে।

সাধারণ মানুষের কিন্তু তাদের সম্পার ওপর আর কোন আস্থা ছিল না। সম্পা তাদের ভবিষ্যতেও কোন নিরাপত্তা দিতে পারবে না এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত ছিল। অথচ সম্পা না চাইলে তারা পাঙচাওয়ের সম্পাকে মানতেও পারে না। কী ভাবে সম্পার এই গোয়ার্তুমি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা ঠিক করতে গ্রামের মানুষের বেশি সময় লাগল না।

দল বেঁধে তারা সম্পার কাছে গিয়ে বলল—আমরা আমাদের শত্রুর সঙ্গে প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছি। স্বাধীনতা রাখতে শহীদ হয়েছে গ্রামের ছেলেরা। ঘটনাটা চিরকাল মনে রাখার জন্যে সম্পার মরুঙে নতুন করে বড় একটা 'খাম' বসাব।

হাঙওয়াঙ গ্রামের মানুষের কথা শুনে খুব খুশি হল। তার ওপর সবার আস্থা অটুট আছে দেখে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের প্রস্তাবে শুধু রাজি হল তাই নয়, প্রয়োজনে তাদের সঙ্গ দেবোও বলল।



bengaliboi.com

পরদিনই গ্রামের মানুষ পাহাড়ের ওপরের দিকে একটা গাছ কেটে সেটাকে গ্রামে টেনে আনার জন্যে বিশাল কাঠটার দুদিকে দুটো ধরার জায়গা তৈরি করে ফেলল।

পাহাড়ের ঢালের কাছাকাছি আনার পর সম্পার কাছে গিয়ে বলল—এই অসাধারণ লড়াইকে মনে রাখার জন্যে আমরা বিশাল গাছ কেটেছি। কিন্তু সেটা এত ভারি যে সবাই মিলেও টেনে আনতে পারছি না।

—ওটাকে যাতে আনা যায় সেই রকমই চেষ্টা করতে হবে। আরো লোক জোগাড় করতে হবে। বলল সম্পা।

—লোক আর কোথায় পাওয়া যাবে। সবাই তো প্রাণ দিল। বলল তারা।

—তাহলে এটাকে ছোট করে ফেললেই তো হয়।

—তা কী করে হয়। সমস্বরে বলল ওরা। এই খাম তোমার আর গ্রামের মর্যাদা বাড়াবে। একে কী ছোট করা যায়?

কথাটা হাঙওয়াঙের খুবই মনে ধরল। বলল—তোমরা যা বলছ তা ঠিক। কিন্তু ওটা আনার আর কী উপায় করা যায়?

গ্রামের মানুষদের মধ্যে কয়েক জন বলল—সম্পা, তুমি যদি একবার পূর্বপুরুষের নামে পুজো করে ওটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে আমাদের সঙ্গে টান দাও, তাহলে ওটা নিশ্চয়-ই হাল্কা লাগবে।

হাঙওয়াঙ ওদের কথা ফেলতে পারল না।

গোম্পাকে দিয়ে পূর্বপুরুষের উদ্দেশে মুরগী উৎসর্গ করে সকলের সঙ্গে পাহাড়ের ঢালে রেখে দেওয়া সেই গাছের বিশাল কাণ্ড টানতে চলে গেল।

গাছের কাণ্ডটায় হাত দিয়ে ছুঁয়ে থাকল সম্পা। অন্যেরা সেটা টানতে আরম্ভ করল।

পাহাড়ের ঢালের বেশ খাড়া জায়গায় হঠাৎ-ই ওদের হাত থেকে ঐ বিশাল গাছের কাণ্ডটা ফসকে গেল।

গুম গুম আওয়াজ করতে করতে গড়িয়ে পড়ল নিচের দিকে।

হাঙওয়াঙ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তার শরীর অতিকায় গাছের কাণ্ডের নিচে দুমড়ে মুচড়ে থেঁতলা হয়ে পাহাড়ের ঢালে প্রায় মিশে গেল।

অন্যদের একজনও কেউ এগিয়ে এল না সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই হাঙওয়াঙের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তাদের সাজানো।

মুক্তি তো পেল তারা। কিন্তু গ্রামে কোন সম্পা না থাকায় কী করবে বুঝে উঠতে পারল না।

কোন রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কেউই অভ্যস্ত না থাকায় গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল সবাই।

ওদের সমস্ত জমি চলে এল পাঞ্চাওয়ের দখলে। এক নাগাড়ে থেমে থেমে নিয়াঙগো অভিযানের গল্প বলে সম্পার ভাই এবার চুপ করল। ঘরের মধ্যে তখন আধা আলো আধা অন্ধকারের সঙ্গে কিছুটা ধোঁয়াও ঢুকে পড়েছে। চোখগুলো কেমন যেন জ্বালা জ্বালা করছে।



bengaliboi.com

একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে গা ভর্তি পুঁতির আর ঘাসের মালা পরে বাঁশের প্রায় আধ হাত সমান চোঙা ভর্তি 'জু' আমাদের দুজনের সামনে ধরল।

ওর চোখ মুখ দেখে মনে হল ঠোঁটে টেপা একটু হাসিও রয়েছে বুঝিবা।

ওর হাত থেকে চোঙা দুটো নিয়ে রাখলাম। সম্পার ভাইকে দেখিয়ে বললাম—ওকে দিলে না।

মেয়েটি কোন উত্তর না দিয়ে ভিতরে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই আরো একটি চোঙা নিয়ে এসে দিল ওকে।

আমি 'জু' ভর্তি চোঙা মুখের সামনে এনে একটা চুমুক দিয়ে বললাম

—ঘটনাটার সঙ্গে তোমার ঐ বর্শা চেরা হাতলের কী যোগ সেটা তো বুঝতে পারলাম না।

প্রশ্নটা যে আমি করবই এটা বোধ হয় ওর জানা ছিল। বলল—ঘটনাটা তো এখনো শেষ হয় নি। নিয়াঙগো গ্রাম দখল করার পরে আমাদের লড়াকু ছেলেরা ফিরে এসে একটা কথাই বার বার বলতে লাগল।

—যে বর্শাটি দিয়ে এই অসাধারণ লড়াই করা হল, যার আঘাতে গুনে গুনে একশো কুড়ি জন পুরুষ প্রাণ দিল তা কোন সাধারণ বর্শা হতে পারে না। নিশ্চয়-ই এর মধ্যে কোন অলৌকিক ক্ষমতা লুকিয়ে আছে।

গ্রামের আধিপত্য বিস্তারে যারা অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে তাদের কথা ফেলতে পারল না সম্পা। ডাকা হল গোম্পাকে। গোম্পা মুরগী উৎসর্গ করে, পুজোটুজো করে বর্শার সরু বাঁশের হাতল মধ্যিখানে কিছুটা লম্বালম্বি চিরে ফেলল। আশ্চর্য হয়ে দেখল সবাই—বাঁশের হাতলের মধ্যে ভর্তি হয়ে রয়েছে রক্ত। নিশ্চয়ই সেইসব মানুষের যারা এর ফলার ঘায়ে ঢলে পড়েছে মৃত্যুর মুখে।

গোম্পা ঘোষণা করল আজ থেকে পাঙ্চাওয়ের বর্শার হাতল সব সময়েই এইরকম চেরা হবে।

সেই থেকেই আমরা এই রীতি মেনে চলেছি।

রাত্রি বেলায় ডায়েরি লিখতে বসে দাসবাবু বললেন

—সম্পার ভাই যে চ্যালেঞ্জ দিয়ে নিয়াঙগো গ্রামের সঙ্গে লড়াই-এর কথা বলল এ রকম চ্যালেঞ্জ দেওয়ার কথা নকতেদের মধ্যে ছিল বলে শুনেছি।

লেখা বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করলাম—তাই নাকি? কোথায় শুনলেন।

উত্তর দেওয়ার আগে প্যাকেট থেকে চারমিনার বের করে একটা আমাকে দিয়ে লণ্ঠন ফাঁক করে নিজে একটা ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—একজন রিসার্চ অফিসারের কাছ থেকে। তখন কি ছাই জানতাম হেডহান্টারদের মধ্যে কাজ করতে আসবো।

—জানলে কী করতেন? অল্প একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম।

—ভাল করে জেনে নিতাম। রিপোর্ট লিখতে কাজে লাগতো।

—ফিরে গিয়ে জানা যাবে না?

—তা হয়তো যাবে। তবে সেই ভদ্রলোক এখন কোথায় আছেন তাতো জানি না।



bengaliboi.com

—সে জানা যাবে। আপনার গল্পটা বলুন।

—গল্প নয়। আমাকে শুধরে দিলেন দাসবাবু।

—ওয়াঙ্চুরা যেমন আচমকা শত্রুর ওপর গেরিলা পদ্ধতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, নকতেরাও সেই রকম আক্রমণ করতো। আবার সামনা সামনি যুদ্ধের জন্যেও ডাকতো। যে রকম সম্পার ভাই বলল।

এই যুদ্ধে ডাকার একটা নিয়মও ছিল।

—কী রকম? প্রশ্ন করলাম।

—যে গ্রাম লড়াই করতে চায় তারা একজন দূতের হাতে দুটো ছোট কঞ্চি পাঠাতো। কঞ্চি দুটো বাঁধা থাকতো। একটা কঞ্চির মুখ ভোঁতা, অন্যটা ছুঁচোল।

—এর নিশ্চয়ই কোন মানে আছে।

—তা আছে। ভোঁতা কঞ্চি মাথা নেওয়ার প্রতীক।

যাদের কাছে এ দুটো পাঠান হত, তারা যদি সামনা সামনি যুদ্ধের ডাক মেনে নিত তাহলে তারা ছুঁচোল কঞ্চিটাও ভোঁতা করে দূতের হাত দিয়ে ফেরত পাঠাত।

পরের দিন থেকে শুরু সামনা সামনি লড়াই। যে রকম পাঞ্চাও আর নিয়াঙগোর মধ্যে হয়েছে।

—আর যদি লড়াই-এ রাজি না হত?

—তাহলে কঞ্চি দুটো কোন রকম না বদলেই ফেরত দিত। কেউ কেউ আবার দুটো কঞ্চিই ছুঁচোল করে দিত। বুঝিয়ে দিত তারা বন্ধুর মতই থাকতে চায়।

—বেশ ভাল নিয়ম তো। আমাদের রামায়ণ মহাভারতের যুগের সম্মুখ সমরের মত। তাই না?

—এ রকম কোন নিয়ম এখানে ছিল কিনা জানতে হবে তো।

—আসলে তখন গল্পটা শুনতে শুনতে আমার ঠিক মনে পড়ে নি। তাহলে তখনই জিজ্ঞাসা করতাম। কিছুটা কুণ্ঠিতভাবে বললেন দাসবাবু।

—কালকে মনে করে জেনে নিলেই হবে। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন?

—কী?

—মুণ্ড শিকারের কায়দা কিন্তু ওয়াঙ্চু আর নকতেদের মধ্যে প্রায় একই রকম ছিল।

—হুঁ। ছোট্ট একটু আওয়াজ করলেন দাসবাবু। আর কথা না বাড়িয়ে ডায়েরি লেখায় মন দিলাম আবার।

## সাত

অন্যদিনের মতো সেদিনও বিকেলের দিকে আমি আর দাসবাবু মিঃ মেগার কোয়ার্টারে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে আসতে গিয়েছিলাম।

মেগার ঘরে ক্যাপ্টেন রাও, ডাঃ চৌধুরী আর মাস্টারমশাই বড়ুয়া, বলতে গেলে প্রশাসনের সব কজন মাথাই বসেছিলেন। আমরা দুজনে ঢুকতেই মেগা বললেন—আহ্‌ক্। দুটো খালি চেয়ার দেখে বসলাম।



bengaliboi.com

দাসবাবু রসিকতা করে বললেন—কোন বিশেষ মিটিং হচ্ছিল নাকি। সব মাথাই এখানে হাজির।

ডাঃ চৌধুরী একটু মনমরা ভাব করে বললেন—আপনাদের আর কী মশাই। গ্রামের মধ্যে গল্পগুজব করে কত কিছু জানছেন। কয়েকদিন পরেই এখান থেকে চলে যাবেন জানেন। আমাদের মতো বছরের পর বছর পড়ে থাকতে হবে না। দেখছেন-ই তো। সাকুল্যে এই তিন-চারজন মানুষ রয়েছি যারা এক সঙ্গে একটু সুখ-দুঃখের কথা বলতে পারি। ক্যাপ্টেন রাও তো আজ আছেন কাল নেই। উনি তো আর অরুণাচলের নিয়মের মধ্যেও পড়েন না।

আমাদের তিন-চারজনই সমব্যথী। তাই সময় সুযোগ পেলেই এক সঙ্গে বসে একটু আড্ডা দিই। আপনারা আসার পরে আড্ডাটায় একটু নতুনত্ব এসেছে। আপনাদের কাছ থেকে এদের সমাজের অনেক কিছু জানতে পারছি যা আমাদের পক্ষে জানার কোন উপায়ও ছিল না।

দাসবাবু বোধ হয় ডাঃ চৌধুরীর কথায় একটু উৎসাহিত হলেন। বললেন—আপনারা কী এই গ্রামের কারো বাড়িতে কখনো গিয়েছেন?

সকলেই মাথা নেড়ে জানালেন—না।

ক্যাপ্টেন রাও বা মিঃ মেগার কথা তাও বুঝতে পারি কিন্তু ডাক্তার বা শিক্ষক কখনো গ্রামের কারো ঘরে ঢোকেন নি শুনে এঁদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কতখানি নিয়ম মাফিক সম্পর্ক তা বেশ আন্দাজ করতে পারলাম।

—কেন বলুন তো? হঠাৎ এদের ঘরে ঢোকার কথা এল কেন?

—তা হলে বেশ নতুন ধরনের বর্শা দেখতে পেতেন। বললেন দাসবাবু।

কি রকম? ক্যাপ্টেন রাও নতুন কোন অস্ত্রের কথা শুনে কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

—মিঃ মেগা, বর্শার হাতল নিশিদের মধ্যে কেমন হয়? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

—কেমন আবার? সবারই তো একই রকম হয়। সরু বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়।

—এদেরও সরু বাঁশ দিয়ে-ই তৈরি হয়। বললেন দাসবাবু। কিন্তু বাঁশটা মধ্যে থেকে চিরে ফেলা হয় বেশ কিছুটা।

—সে আবার কী? অনেকটা অবাক হয়েই বললেন ক্যাপ্টেন রাও। এর আবার কী অ্যাডভান্টেজ আছে বুঝতে পারছি না।

দাসবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও এঁদের ধাঁধায় পড়ে যেতে দেখে মজা উপভোগ করছিলাম।

বললাম—সবই কি আর টেকনিক্যাল সুবিধে অসুবিধে দিয়ে বোঝা যায় রাও সাহেব। কোথাও কোথাও আমাদের মত এই ফালতু কাজের লোকেরও দরকার হয় এ রকম কিছু জানার জন্যে।

আর বেশি ভণিতা না করে দাসবাবুকে আমাদের শোনা পুরো গল্পটা বলতে বললাম। দাসবাবু বেশ গুছিয়ে এবং কিছুটা রসিয়েও সকালের শোনা কাহিনীটি বললেন। চা খেতে খেতে মনযোগ দিয়েই শুনলেন সবাই।

কী ভয়ানক না?



bengaliboi.com

—কেন? জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি দেখানোর জন্যে এদের মতো মানুষও নিজেদের অধীনে দু-চারটি গ্রাম রাখতে চায়। আমরা তো জানি শুধু সাম্রাজ্যবাদ যারা মেনে নিয়েছে সেই সভ্য সমাজেই হয়। আদিবাসীদের মধ্যেও যে সাম্রাজ্যবাদের এই রকম প্রথা সমাজের গভীরে ঢুকে আছে তা ভাবতেও কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে।

মেগার কথায় বিস্ময়ের থেকে বেশি ক্ষোভ আর বিরক্তি ফুটে উঠল।

মেগার মনের এই অবস্থা কিছুটা হালকা করার জন্যে বললাম—এদের মধ্যেও 'ইগালেটিরিয়ন' ব্যাপারটা রয়েছে। কিন্তু তা শুধুমাত্র 'ইকনমির' ক্ষেত্রেই আছে।

অধীনে থাকা গ্রামও কিন্তু নিজের মত করে চাষবাস করার অধিকার পায়। শুধুমাত্র ক্ষেত্র বিশেষে 'সম্পাকে' কিছু ভেট দিতে হয়।

অরুণাচলের এই তিরাপ জেলার 'নকতে'-দের মধ্যে এই ধরনের 'চীফ' প্রথা ছিল এককালে, এখন লোহিত জেলার খামটি বা সিংফোদের মধ্যে 'চীফ' আর সাধারণের মধ্যে একটা গন্ডি রাখলেও এদের মধ্যেও কিন্তু রাজা-প্রজা বা জমিদার প্রজার সম্পর্ক বলে কিছু নেই। খাজনা দেওয়ার কোন প্রথাও নেই।

অরুণাচলের অনেক আদিবাসীদের মধ্যেই কিন্তু নিজেদের অধীনে অন্য আদিবাসীদের রাখার প্রথা ছিল।

মেগাকে বললাম—আপনাদের আপার সুবণশিরি জেলাতেই তো নিশিঙরা তাদের অধীনে সুলুঙ-দের রাখত। সুলুঙের নাম শুনেছেন তো? জিজ্ঞাসা করলাম। মেগা ঘাড় নাড়লেন।

বললাম—যদি হুরি বা সারলি অঞ্চলে যান, দেখবেন প্রতিটি নিশিঙ পরিবারের সঙ্গেই একটি সুলুঙ পরিবার রয়েছে। এরা যে পরিবারের সঙ্গে যুক্ত তাদের চাষবাসের সমস্ত কাজ ছাড়াও অন্যান্য কাজ করে। আপার সুবণশিরির তাগিনদের মধ্যেও এই রকম অন্যদের ধরে এনে রেখে দেওয়ার প্রথা ছিল। আপাতানিদের মধ্যে তো এই রকম প্রথার ফলে সমাজে দুটো প্রধান শ্রেণীর-ই সৃষ্টি হয়েছে। একদল মালিক, অন্যদল শ্রমিক। হলে কী হবে, বিয়ে বা অন্য কোন ব্যাপারে কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য নেই।

আসলে পাহাড়ের এইসব দুর্গম অঞ্চলে চাষবাস করার জন্যে প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন হয়। সেই জন্যেই এইভাবে অন্যদের ধরে এনে চাষবাসের কাজে লাগানো হত।

এদের কিন্তু সমাজের মধ্যে মিশিয়ে নিতে কেউই পিছপা হয় নি।

মাস্টারমশাই বড়ুয়া এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। একটু নড়েচড়ে বসে এবার বললেন

—একটা জিনিস জানতে ইচ্ছে করে।

—বলুন।

—আপনারা যে এদের গ্রাম দখল বা লড়াই-এর কারণ বললেন, সেগুলিই প্রধান? মানে আমি বলতে চাইছি আমাদের দেশে রাজকন্যা বা জমিদার কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাদের হরণ করে আনার জন্যে যুদ্ধ করত, সেইরকম কোন কারণে কী লড়াই করে না?

—আপনার প্রশ্নটা আমার মনেও অনেকবার জেগেছে। বললাম আমি। আর সেই



bengaliboi.com

জন্যেই এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে খোঁজখবরও নিয়েছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত শুধু এই কারণেই লড়াই হওয়ার কোন উল্লেখ পাই নি।

—তবে এই খনসার আশেপাশে, বিশেষ করে লাজু বলে জায়গায় যে সব নকতে আদিবাসী থাকে তাদের মধ্যে একটা প্রচলিত গল্প আছে।

মাথা শিকারের উৎপত্তির পিছনে নাকি এই মেয়েরাই আছে। বড়ুয়া খুব উৎসাহিত হয়ে বললেন—থাকতেই হবে। এটাই তো স্বাভাবিক।

—গল্পটা শুনি। বড়ুয়াকে থামিয়ে দিলেন ডাঃ চৌধুরী।

—দাঁড়ান। একটু ধোঁয়া খেয়ে নিই।

প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে গল্পটা শুরু করলাম।

—আদ্যিকালে মানুষ এখনকার মতো পশুপাখিদের থেকে আলাদা থাকত না। সবাই এক সঙ্গে মিলেমিশেই থাকত। কোন রকম ঝামেলা ছিল না।

—গোল বাধল যখন মানুষের সংখ্যা গেল বেড়ে। এক সময় দেখা গেল পুরুষদের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা বেশ কম। ফলে যা হবার তাই হল।

কোন একজন মেয়েকে নিজের করে পাওয়ার জন্যে পুরুষদের মধ্যে শুরু হল ঝামেলা, মারামারিও হতে লাগল। এই রকমই এক মেয়েকে পাওয়ার লড়াই-এ পাতেই বলে একজন পুরুষের প্রাণ গেল একজনের হাতে।

পাতেই-এর এক ভাই ছিল। বয়স ছিল খুব-ই কম। ও ঘটনাটা শুনেছিল। কিন্তু বয়স কম থাকায় ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। যুবক হয়ে ওঠার পরে একটা ছোট্ট ঘটনা তাকে মনে করিয়ে দিল তার দাদার মারা যাওয়ার কথা।

—কী রকম? জিজ্ঞাসা করলেন মেগা।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে একটু দম নিয়ে বললাম

—ছেলেটি জঙ্গলে গিয়েছিল শিকার করতে। সেই সময় ওকে একঝাঁক মৌমাছি আক্রমণ করে।

মৌমাছির হুল ফোটানোর অসহ্য যন্ত্রণা তাকে হঠাৎ-ই মনে করিয়ে দেয় দাদার কথা। ছেলেটি ভাবল সামান্য মৌমাছির হুল ফোটানোতেই যদি এত কষ্ট হয়, দা আর বর্শার আঘাতে দাদা না জানি কত মারাত্মক কষ্ট পেয়ে মারা গেছে।

সেই মুহূর্তেই প্রতিশোধ নেওয়ার কথা মনে জেগে উঠলো। যা ভাবা তাই কাজ। সবাই তো একই জায়গায় থাকত। তাই দাদা কার হাতে মারা গেছে তা জানা ছিল। ফিরে এসে কোন রকম সময় নষ্ট না করে দাদার হত্যাকারির মাথা দিল কেটে।

—ব্যাস, শুরু হয়ে গেল মাথা শিকারের পালা।

এর বদলা নেওয়ার জন্যে লাগল লড়াই। আত্মীয়স্বজনরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেল। কাটা পড়ল আরো কিছু মাথা। সেই থেকে নরমুণ্ড শিকারের প্রথার শুরু।

ক্যাপ্টেন রাও এতক্ষণ চুপচাপ আমার বকবকানি শুনছিলেন। কথার মোড় ঘুরিয়ে এবার বললেন

—আপনি যে বলছিলেন এদের রাজ পরিবারের পুরুষ অন্য গ্রামের ওয়াঙহাম মেয়েকে নিয়ে এসে বিয়ে করে। এর জন্যে শত্রুতা হয় না?



bengaliboi.com

—না, হয় না। এটা এদের সামাজিক প্রথার-ই অঙ্গ। সেই জন্যে যখন কোন ওয়াঙহাম পুরুষ অন্য গ্রামের ওয়াঙহাম মেয়েকে তুলে নিয়ে এসে বিয়ে করে সেটাকে লড়াই করার মতো গর্হিত কাজ বলে মনে করা হয় না। আসলে লড়াই-এর সমস্ত ব্যাপারটাই কর্তৃত্ব আর প্রভাব জারি করার একটা উপায়।

ডাঃ চৌধুরী এবার মুখ খুললেন।

—আপনারা তো এদের মরুঙেই আছেন। শুনেছি মরুঙেই ছেলেমেয়েরা যৌন শিক্ষার হাতেখড়ি পায়। এই কদিনে নিশ্চয়-ই আপনাদের সেরকম কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। আলোচনার বিষয়বস্তু হঠাৎ-ই ঘুরে যাওয়ায় অন্য সকলেই একটু নড়েচড়ে বসলেন।

এর মধ্যে আর এক কাপ চা এসে গেছে। চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বেশ তৃপ্তি পেলাম। বুঝতে পারছিলাম এরা সকলেই আমাদের কাছ থেকে বেশ কিছু রসালো গল্প শুনতে আগ্রহী।

আমি দাসবাবুকে দেখিয়ে দিয়ে বললাম—এ ব্যাপারটা দাসবাবু-ই বোধ হয় আপনাদের ভাল বলতে পারবেন। উনিই ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছেন। দাসবাবু তার চারমিনারে একটা লম্বা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে একটু গুছিয়ে বসলেন। বললেন—বলুন কী ধরনের বিষয় জানতে চান।

—আচমকা এই ধরনের প্রশ্নের জন্যে কেউই যেন ঠিক প্রস্তুত ছিল না। সকলেই যেন একটু হকচকিয়ে গেলেন। সকলের মুখেই কেমন একটু দ্বিধার ভাব।

ডাক্তার-ই সেই ভাব কাটিয়ে বললেন—মরুঙ-এর মধ্যেই কী এদের ছেলেমেয়েরা একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়? সবার সামনে এই ধরনের কাজ করতে লজ্জা পায় না? দাসবাবু সিগারেটে এবার ছোট একটা টান দিয়ে বললেন—মরুঙ-এর মধ্যে এই ধরনের কোন ব্যাপার-ই হয় না।

কথাটা কারুর-ই বোধ হয় বিশ্বাস হল না।

বরুয়া প্রায় অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললেন—কী বলছেন। ওখানে তা হলে হয়টা কী? আমরা তো মরুঙ-এর এটাই প্রধান বিষয় বলে এতদিন জেনেছি।

ঠিক জানেন নি। দাসবাবুর গলার স্বর বেশ গম্ভীর লাগল। মরুঙে প্রধানত গ্রামের ছেলেরা গ্রাম রক্ষা করার শিক্ষা পায়। এর সঙ্গে সমাজের রীতি-নীতিও শেখে। সেক্স-এর ব্যাপারে শিক্ষার হাতেখড়িতে মরুঙের তেমন কোন কাজ নেই।

অন্য অনেক আদিবাসীদের যেমন গ্রামের মধ্যে একটিই 'ডরমিটরি' থাকে, ওয়াঙ্চুদের সে রকম নয়। এই গ্রামেই তো পাঁচটা মরুঙ রয়েছে। গ্রামের মধ্যে একটা আর চারদিকে চারটে।

প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা মেম্বার। এরা লড়াই-এর শিক্ষা মোটামুটি এখানেই পায়। এক একটি মরুঙ-এর নিজের যে এলাকা রয়েছে তার দেখাশোনা করা আর হঠাৎ করে বাইরের কেউ যেন ঐ দিকে থেকে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্যে সব সময় সতর্ক থাকার শিক্ষাও পায়।

—তা হলে সেক্স-এর ব্যাপারটা শেখে কোথায়? এবার প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন রাও।



bengaliboi.com

আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, মেয়েদের কিন্তু মরুঙে ঢোকা বারণ। কিছুটা নাটকীয়ভাবে বললেন দাসবাবু।

—সে কি? সমস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করলেন সবাই।

—আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মরুঙ-এ যেহেতু নরমুণ্ড শিকার করে এনে রাখা হয় সেই জন্যে অন্য ঘরের থেকে একে আলাদা আর পবিত্র মনে করা হয়।

—পবিত্র জায়গায় মেয়েরা ঢুকতে পারবে না এ আবার কেমন কথা মশাই।

—মেয়েরা মাঝে মাঝে অপবিত্র হয় এটা জানেন তো। কিছুটা ঠেস দিয়েই কথা কটি বললেন দাসবাবু। আপনার আমার সমাজেও তো এটা মানা হয়। তাই না?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই দাসবাবু বললেন—অন্যের কথা বলতে পারবো না, কিন্তু আমাদের ঘরেই তো মাসের মধ্যে তিন-চার দিন মেয়েরা বাড়িতে রান্না ঘরে পর্যন্ত যেতে পারে না।

—সেটি তো তিন-চার দিনের ব্যাপার। তাছাড়া মরুঙ কী আমাদের মন্দির না কি? মাস্টারমশাই মুখ খুললেন।

—এরা মুণ্ড তো শিকার করে প্রাচুর্যের জন্যে। এর সঙ্গে তো মিশে আছে বহুকাল ধরে চলে আসা বিশ্বাস। সেই নরমুণ্ড যেখানে থাকে তাকে তো পবিত্র-ই মানবে। এখানে মেয়েদের ঢুকতে দেওয়ার অর্থই গ্রামের অমঙ্গল ডেকে আনা।

দাসবাবুর কথাগুলো শুনে সবাই হতাশ-ই হলেন না, কেন জানি ঠিক বিশ্বাসও করে উঠতে পারলেন না।

ওঁদের এই নিরাশ ভাব দেখে একটু চাঙা করার জন্যে বললাম

—আপনারা যে ধরনের ডরমিটরির কথা বলছেন তা কিন্তু ভারতবর্ষে একমাত্র মধ্য প্রদেশের বস্তার জেলার মুরিয়াদের মধ্যে এখনো আছে।

—সকলে একটু সোজা হয়ে বসলেন।

—এই ধরনের ডরমিটরির আদিবাসীদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। যে নামই হোক এর মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এক। সমাজে ডিসিপ্লিন্ড ছেলে-মেয়ে তৈরি করা। এখানে একে অন্যের সংস্কৃতি মুখে মুখে এক জেনারেশন থেকে আর এক জেনারেশনে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। গ্রামের অতিথিদের কীভাবে দেখাশোনা করতে হয়, তাও এই ডরমিটরিতেই শেখে।

সেক্স-এর ব্যাপারটাও থাকে, তবে তা কখনই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় না। এটা সাধারণত ডরমিটরির বাইরেই নিজেদের পছন্দ মতো জায়গায় হয়।

মেগা অনেকক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন। তবে কথাগুলো যে খুব মনোযোগ দিয়েই শুনছিলেন তা বুঝতে অসুবিধে হল না যখন বললেন—আপনি বস্তারের মুরিয়াদের কথা কী যেন বলতে গিয়ে আর বললেন না।

আমি 'ঘতুলের' কথা বলছিলাম।

বস্তারের নারায়ণপুরের কাছে মুরিয়াদের ঘতুলেই শুধু বিয়ে না হওয়া ছেলেমেয়েরা



bengaliboi.com

একসঙ্গে থাকে। আপনারা যে ধরনের 'সেক্স'-এর শিক্ষার কথা বলছেন তা শুধু ঘতুলেই হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে বাইরের কোন লোককে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

আদিদের 'মসুপ'-ও কিন্তু খুবই ভাল। বললেন মেগা। নাচ-গান আর কাজের মধ্যে দিয়ে কী সুন্দরভাবে ট্র্যাডিশন ধরে রাখে তা না দেখলে বলে বোঝান যাবে না।

—কিন্তু এইসব ভাল ভাল জিনিস-ই তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। দুঃখ প্রকাশ করলেন দাসবাবু। হয়ত কয়েক বছর পরে ওয়াঙ্চুদের মরুঙ-ও থাকবে না। হারিয়ে যাবে মাথার খুলিগুলো আর তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অনেক কালের বিশ্বাস আর কত রোমহর্ষক কাহিনী।

—নাঃ, এবার ওঠা যাক। ঘড়ি দেখে বললেন দাসবাবু।

আর কথা না বাড়িয়ে আবার আসবো কবুল করে ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম।

## আট

গ্রামে থাকা প্রায় দু'মাস হতে চলল।

মোটামুটি সবাই জেনে গেছে আমরা এখানে তাদের সম্বন্ধে জানতে এসেছি।

মানুষের কত রকমের কাজ থাকে। এটাও সেই রকম একটা কাজ। সত্যি কথা বলতে কী অনেক সময়, অনেক জায়গাতেই এইভাবেই আমরা গ্রামের মানুষের কাছে তাদের মধ্যে দিনের পর দিন থেকে কাজ করার ব্যাখ্যা দিয়েছি।

মানুষ যে কী করে 'ক্ষেতি-বাড়ি' না করে থাকতে পারে তা ভেবে অনেকেই আশ্চর্য হয়েছে।

তাই অনেকেই আমাদের নিষ্কর্মা হিসেবেও ভেবেছে। আমাদের নিয়ে কৌতূহলও যে কম নয় তা একদিন কাজ করার সময় টের পেলাম। দোভাষীকে নিয়ে সেদিন কাজ করছিলাম।

রোজকার মতই 'ঘরত আছ নাকি' হাঁক দিয়ে ঢুকলাম একজনের ঘরে। ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসার আগেই একটা কাঠের তক্তা দেখিয়ে বসতে বলল আমাদের দোভাষী। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল বাড়ির কর্তাকে।

বাচ্চারাও জড়ো হয়ে গেছে। অল্প একটু দূরত্ব রেখে আমাদের লক্ষ্য করছে কৌতূহল ভরে। ওরা সবাই এতদিনে জেনে গেছে আমাদের দুজনের ঝোলায় 'মিঠাই' থাকে।

দাসবাবু তাঁর ঝোলা থেকে লজেন্স বের করে ছেলেগুলোকে ডাকলেন। গুটি গুটি পায়ে সবাই এগিয়ে এল। এতদিন দেখার পরে আর আমাদের মধ্যে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই তারা ভাল করেই জেনে গেছে।

লজেন্স নিয়ে কিন্তু চলে গেল না। আমাদের আশেপাশেই থাকল।

আমাদের দেখে বাড়ির কর্তার পিছনে তার স্ত্রীও হাজির। দোভাষী বাড়ির কর্তার নাম বলল লঙগুঙ।

আমার পাশে বসতে বললাম। পাশে না বসে ও আমার সামনে উবু হয়ে বসল। লেংটি



bengaliboi.com

ছাড়া সারা শরীরে আর কোন আবরণ নেই। তবে গলায় দেখলাম কাঠের ছোট্ট একটি নরমুণ্ড ঝুলছে। দু'চোখের পাশে রয়েছে উল্কির দাগ।

এগুলো জানান দিল ও অন্তত একজন মানুষের মাথা কেটেছে। সঙ্গে মাথা শিকারেও এক দুবার গেছে। বয়স কত হবে ঠিক আন্দাজ করা মুশকিল। জিজ্ঞাসা করলেও ঠিক বলতে পারে না। বয়সের হিসেব রাখার দরকার-ই বা কী।

নরমুণ্ড শিকার করেছে। বিয়ে থা করে ছেলেপুলের বাবা হয়েছে। সমাজে বয়স্ক মানুষ হিসেবে স্থান পেয়েছে।

জীবনে মানুষ এই সবই তো পেতে চায়।

তাহলে আর বয়সের হিসেব কষ্ট করে কে রাখে। আর তা কীভাবে রাখতে হয় তাই বা কজনে জানে? ওকে দেখে আন্দাজ করলাম বয়স পঞ্চাশের আশেপাশে হবে।

আমাদের কথা শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে বাঁশের গ্লাসে নিয়ে এল 'জু'। সাত সকালে 'জু' খাব না বলা ঠিক হবে না। এদের সম্মানে ঘা লাগতে পারে।

ওর হাত থেকে বাঁশের গ্লাস নেওয়ার সময় জিজ্ঞাসা করলাম—ভাল্?

এই মেয়েটিকে আমি আমাদের মরুঙের আশেপাশে অনেক সময় ঘোরাফেরা করতে দেখেছি অন্যদের সঙ্গে। ও অল্প হেসে ঘাড় কাত করল।

কান থেকে ঝুলছে চুড়ির মতো বড় দুল। বেশ কতগুলো মোটা মোটা রূপোর বাজুবন্ধ দু'হাতে। একই জিনিসের বালাও রয়েছে দু'হাতে। শক্তপোক্ত শরীর। নাক একটু চ্যাপ্টা। দু'পায়ে সুন্দর উল্কির চিহ্ন। কোমর থেকে নেমে এসেছে মেরুন রঙের এক টুকরো কাপড় কোমরের কাছে বেশ নক্সা করা।

মেয়েটির মা-ও ততক্ষণে এসে বসেছে।

মেয়ের তুলনায় মায়ের গলায় ঘাসের মালা বেশি। পুঁতির কম। হাতে আর বাজুতে অবশ্য একই রকমের বালা আর বাজুবন্ধ পরেছে। গায়ের রঙ তামাটেই মনে হল।

কোমর থেকে নেমে আসা কাপড়ের টুকরো তুলনায় অনেক ছোট।

মেয়েটি মায়ের ঠিক পেছনে দাঁড়াল।

বাচ্চাগুলো দেখলাম বেরিয়ে গেল।

আমাদের কথাবার্তা সবই হল দোভাষীর মাধ্যমে।

হঠাৎ-ই মহিলা গলার স্বর একটু নামিয়ে দোভাষীকে কী যেন বলল।

ও আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলল

—আপনাদের কাছ থেকে একটা কথা জানতে চাইছে। ওর চোখের কোণে অল্প একটু মিটিমিটি হাসির ছোঁয়া।

—কী? প্রশ্ন করলেন দাসবাবু।

—বলছে আপনারা মরুঙে এতদিন ধরে রয়েছেন, গ্রামের মধ্যে ঘোরাফেরা করা ছাড়া কোন কাজ নেই। আপনাদের ঘরে কী বৌ-ছেলে-মেয়ে নেই? যদি থাকে তাহলে তাদের ছেড়ে আপনারা কী করে এখানে পড়ে আছেন? তাদের কে দেখাশোনা করবে?



bengaliboi.com

—না, বৌ-টৌ নেই। দুজনেই অনেকটা হাল্কাভাবেই মজা পাওয়ার ঢঙে বললাম। যদিও তখন দাসবাবু বৌ-মেয়েকে নিয়ে পুরোমাত্রায় সংসারী।

কথাটা মহিলাকে বুঝিয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম ও আমাদের দিকে বেশ দুষ্টুমি ভরা হাসিহাসি ভাব নিয়ে তাকাল। তারপর দোভাষীকে যা বলল তা দোভাষী আমাদের শোনাল।

—বলছে গ্রামে অনেক ভাল ভাল মেয়ে রয়েছে। তোমাদের মরুঙের ওদিকেও তারা যায়। চাইলে ওদের নিয়ে ঘর বাঁধতে পার গ্রামে। সম্পার নিশ্চয়-ই আপত্তি হবে না। আমাদের সামনে বসে কোন মহিলাই এতদিন এরকমভাবে রসিকতা করে নি। তাও আবার নিজের মেয়ের সামনে। আসলে অনেকের ইচ্ছে থাকলেও ভাষার অসুবিধে থাকার জন্যে কেউ আগ বাড়িয়ে কথা বলতে পারে না।

রসিকতার জবাব রসিকতাতেই দেওয়া ভাল। তবে ঢেঁকি নাকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙ্গে।

নৃতাত্ত্বিকের এর মধ্যেও আবার কিছু তথ্য পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে। তাই বললাম

—তোমরা বললেই মেয়েরা রাজি হবে কেন?

—হবে নাই বা কেন? উল্টে প্রশ্ন করল মহিলা।

—আমাদের দু'জনের কেউই তো মাথা কাটি নি, কোন মাথা কাটার লড়াই-এও যাই নি। তোমাদের মেয়েদের কাছে তো আমাদের কোন দাম-ই নেই।

মহিলা বোধ হয় এ ধরনের জবাব আশা করে নি। চট করে কোন উত্তর দিল না। একবার মেয়ের দিকে আর একবার স্বামীর দিকে কয়েক পলক তাকাল।

মেয়ের চোখেমুখে মজা পাওয়ার চাপা চকচকে হাসির আভা। লঙগুঙ দেখলাম আলতোভাবে তার গলায় ঝোলান ছোট্ট মানুষের মাথার প্রতীকটাতে হাত দিল।

অল্প কিছুক্ষণ পরে যখন মহিলা কথা বলল তখন আর গলায় সেই মজার লেশমাত্র নেই।

বিষাদের সুরে কথাগুলো কেমন ভারাক্রান্ত। বলল—এখনকার মেয়েরা তো এই ব্যাপারটার গুরুত্বই জানে না ঠিক মতো। বীরপুরুষ বলতে কী বোঝায় তা আমরা ছোট্টবেলা থেকেই মা-ঠাকুমার কাছ থেকে জেনেছি। পুরুষ, সে যেই হোক, মাথা শিকারের লড়াই-এ গেছে শুনলেই আমাদের বয়সকালে সবাই উত্তেজনায় টান টান হয়ে থাকতাম। কখন তারা ফিরে আসবে। কখন তাদের চোখ মুখ শরীরের সমস্ত অঙ্গ থেকে ফুটে বেরোনো বীরত্বের দেখা পাবো। কার কাছের মানুষ মাথার সঙ্গে নিয়ে আসবে গ্রামের সম্মান।

—সে এক অসাধারণ মনের অবস্থা। যার নিজের মানুষ মাথা নিয়ে আসতো তাকে দেখতেও আমাদের ভীড়। তাকে একবার কোন অছিলায় ছুঁতে ইচ্ছে করত।

—তোমার স্বামীও তো মাথা শিকার করেছে। তোমার বন্ধুবান্ধব নিশ্চয়-ই তোমাকে হিংসে করেছে।



bengaliboi.com

আমার কথায় হেসে ফেলল মহিলা। মিশ কালো দাঁতগুলি স্বল্প আলোতেও দেখা গেল।

স্বামীর দিকে এই বয়সেও বেশ গরবিনীর চোখে একবার তাকিয়ে বলল

—হিংসে করবে কেন? হয়তো না পাওয়ার আফশোস হয়েছে।

ওর কথা বলার বাঁধুনি দেখে বেশ আশ্চর্য হলাম। কে বলে এরা অশিক্ষিত। অ-আ, ক-খ-ই পড়ে নি। কিন্তু তাই বলে কথার শৈলীতে কম যায় না।

এত সব শোনার পরেও একটু খাপছাড়া ভাবেই বললাম

—একটা মাথা কেটে নিয়ে আসা মানুষের সঙ্গে ঘর করতে তোমার ভয় লাগে না?

—ভয়? আমার বেখাপ্পা প্রশ্নটা যেন ওর মাথায় ঠিক মতো ঢুকতেই পারল না।

—ভয় কিসের জন্যে? এতক্ষণ তা হলে কী বুঝলে? আমাদের কজন মেয়ের এরকম সৌভাগ্য হয়?

—এবার আমি এদের মেয়েকে প্রশ্ন করলাম।

—তোমার ভয় করে না বাবা মানুষের মাথা কেটে এনেছে জেনে?

—তা করে না। বরঞ্চ মাঝে মাঝে মনে হয় বাবা গ্রামের সম্মানের জন্যে লড়াই করেছে। সে লড়াই-এ শত্রুকে মেরেছে। ভাবতে ভালই লাগে।

—এখন যদি কেউ মাথা শিকার করে আনে তাকে বিয়ে করবে?

মা-বাবার সামনে এই প্রশ্ন করাটা হয়তো আমাদের নিজেদের সমাজে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলতে পারতো যে কোন মেয়েকে। কিন্তু এদের খোলামেলা সমাজে তার সম্ভাবনা নেই।

মেয়েটি সপ্রতিভ ভাবেই বলল

—এই প্রথাতো শেষ হয়ে গেছে। থাকলে নিশ্চয়-ই করতাম। এতক্ষণ দোভাষীর মাধ্যমেই সব কথা হচ্ছিল বলে লঙগুঙ প্রায় চুপচাপই সেই তখন থেকে উবু হয়ে বসে শুনছিল। এবার সরাসরি সে আমাকে প্রশ্ন করল

—তোমাদের মেয়েরা কী রকম পুরুষ চায়?

অতি কঠিন প্রশ্ন। আমি কী ছাই নিজেই জানি। তাই উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু বললাম

—আমাদের তো তোমাদের মতো বীরপুরুষ হওয়ার কোন প্রথা নেই। মেয়েরা যে কী চায় জানলে তো আমরা তাই হতে চেষ্টা করতাম।

মেয়েটি আমার কথা বুঝতে পেরেছে দেখলাম। মিশমিশে কালো রঙ করা দাঁতগুলো প্রকাশ করে খিলখিল করে হেসে উঠল।

আজকের সকালটা খুব ভাল লাগল।

গ্রামের মেয়েরাও আমাদের কাছের মানুষ ভেবে নিতে পেরেছে দেখে।

বাঁশের গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে আবার আসবো বলে উঠে পড়লাম।



bengaliboi.com

গ্রামের একেবারে শেষে হারামে (চাষের জমি) রোজই সকালবেলায় পুরুষেরা চাষ করার জন্য সার বেঁধে যায়।

এই সারি দিয়ে যাওয়ার কারণ জানতে চেয়েছি অনেকের কাছে। চট জলদি জবাব কেউ-ই দিতে পারে নি। এর মধ্যে যে আবার কোন কারণ থাকতে পারে সেটাই তো কেউ চিন্তা করতে পারে নি।

তবে সম্পা তার নিজের মতো করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে ছিল।

—মাথা শিকারের দেশ। হঠাৎ কোন দিক থেকে আক্রমণের আভাস পেলে সামনের মানুষ সঙ্গে সঙ্গে পিছনের সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারে।

পাহাড়ি আঁকা বাঁকা সরু রাস্তায় এক সঙ্গে সবাই আক্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচা যায়।

পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও সারি দিয়ে লম্বা বেতের টুকরি পিঠে নিয়ে জ্বালানি কাঠ আর লম্বা বাঁশের চোঙা ভর্তি জল আনতে যায়।

চাষবাসের কাজ দেখার জন্য একদিন এদের সঙ্গে আমরাও রওনা হলাম।

বেশ ভালই লাগছিল লাইন করে যেতে। বাঁ পাশে পাহাড়ের চড়াই। ডান দিকে ঢাল হঠাৎ-ই নেমে গেছে।

পাহাড়ের গা বেয়ে সরু চলার পথ এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে। বেশ সাবধানেই চলতে হয়।

একটু অন্যমনস্ক হলেই ডান দিকে গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। তবে অরুণাচলের অন্য জায়গার মতো এখানের পাহাড়ের মাটি অত আলগা নয়। আর খাদও তেমন মারাত্মক নয়। তবু সাবধান হতেই হয়।

শীতের সকালের শিশির আর কুয়াশায় ভেজা পথ। আমাদের সঙ্গীরা খালি পায়ে বেশ সহজেই এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমরা লাইনের মধ্যে থেকে ওদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছি না।

ওদের চলার গতিও কমে যাচ্ছে। হাসাহাসি করছে সরু রাস্তায় আমাদের টালমাটাল অবস্থা দেখে।

এর ওপরে আবার মাঝে মাঝেই কুয়াশায় ঘেরা বাঁক রয়েছে। সেগুলো পার হতে গিয়ে প্রায় অন্ধের মতো এদের অনুসরণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কুয়াশার বাঁকের পরক্ষণেই আবার পরিষ্কার আলো। চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

এর মধ্যেই আমার ঠিক সামনে থাকা দাসবাবু বললেন

—একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন?

—কী?

—দেখুন, ঐ যে সামনের মেয়েটি। ওকে আমাদের মরুঙ-এর ওয়াঙকঙ 'চালি' দিচ্ছে। চালি এখানের এক রকমের গাছের ছাল। এটা এদের প্রায় সবাই সব সময় মুখে দিয়ে চিবোয়। আমিও কয়েকবার খেয়েছি। মুখ একটু লালচে হয় খেলে। এতে এমন কী দেখার আছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। বললাম



bengaliboi.com

—তাতে কী হয়েছে।

—আমাকে একদিন ওয়াঙকঙ বলছিল এই ভাবেই রাস্তা ঘাটে চালি দিয়ে ছেলেরা সময়ে সময়ে একটি মেয়েকে জানান দেয় যে তার মেয়েটিকে ভাল লেগেছে।

—তাই নাকি? এটা তো জানা ছিল না। তাহলে আমাদের ওয়াঙকঙ বলছেন ঐ মেয়েটিকে ভালবেসেছে। আমি কিন্তু ওর পছন্দের তারিফ করবো।

—কেন?

—মেয়েটিকে লক্ষ্য করেছেন? চুলের ছোট ছোট ছাঁট দেখেই তো বুঝতে পারছেন ওয়াঙপান।

গায়ের রঙ দেখুন—বেশ ঘন বাদামী। বয়স পনেরো-ষোলো বছরের বেশি হবে না বলেই তো মনে হয়।

পিঠে দেখুন টুকরিতে জল আনার জন্যে গোটা চারেক বাঁশের বেশ লম্বা চোঙা। ফেরার পথে নিশ্চয়-ই ঝুড়ি বোঝাই করে কাঠও আনবে। আন্দাজ করছি দু-পায়ে দারুন সুন্দর উল্কিও আছে। বিয়ের বয়স হয়েছে, সে তো ও নিজেই জানিয়ে দিচ্ছে।

এই রকম শক্ত সমর্থ কাজের মেয়েকে ভাল লেগেছে আমাদের ওয়াঙকঙ-এর।

ওকে নিয়ে একটু মজা করা যাক।

—ওয়াঙকঙ। গলা তুলে ডাক দিলাম। লাইনে চলার সময় সাধারণত এইভাবে চিৎকার করা চলে না। সকলে একটু অবাক-ই হল। যাই হোক এর মধ্যেই ও আমার কাছে এগিয়ে এল।

ওকে আমার সামনে ঢুকিয়ে নিয়ে বললাম—তোমার পছন্দ তো বেশ ভালই দেখছি। আমার ঝোলায় মিঠাই আছে। দেবে নাকি তোমার বান্ধবীকে?

—কথাটায় কোন লজ্জা পেল না। তবে বলল

—চালি তো দিলাম। মিঠাই দিয়ে আর কী হবে? তোমার ঝোলায় তো আয়না থাকে। তার একটা পেলে ওকে দিতে পারি।

—চিরুনিও আছে। দেবে নাকি? মুচকি হেসে বললাম।

—দাও। খুব খুশি হল।

—আমি যদি এগুলো ওকে দিই, তোমার আপত্তি আছে? রগড় করেই বললাম।

ও-ও দেখলাম সেয়ানা আছে। মিচকি হেসে বলল

—দিতে পার। তবে নেবে কিনা জানি না। আর যদি নেয় তাহলে তো তোমাকে বরাবরের জন্যে আমাদের গ্রামেই থাকতে হবে।

—মানে? এবার একটু চমকে উঠে হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খেলাম।

—মানে আবার কী? তোমার কাছে আয়না নিলে অন্য মেয়েরা ওকে ছেড়ে দেবে নাকি? না তোমাকেই রেহাই দেবে? চালি দেওয়া, আয়না দেওয়া জান তো ভাব-ভালবাসা করার জন্যেই দিই আমরা। ইচ্ছে থাকলে বল।

—না থাক। তোমার কষ্ট হবে।

—ঠিক আছে। এখানে যারা আছে তার মধ্যে কাকে দিতে চাও বল?



bengaliboi.com

আমাকে আমার-ই কথায় বেকায়দায় ফেলতে পেরে বেশ খুশি হয়েছে দেখলাম।

আর কথা না বাড়িয়ে ঝোলা থেকে একটা ছোট্ট গোল আয়না আর পকেট চিরুনি ওর হাতে গুঁজে দিলাম।

—ওর আর তর সইল না। লাইন থেকে বেরিয়ে ওর মধ্যেই মেয়েটির কাছে প্রায় উড়েই গেল। কী একটা বলল যেন। হাঁটতে হাঁটতেই মেয়েটি দেখলাম একবার ঘাড় ঘোরানোর চেষ্টা করল। তারপর হাত বাড়িয়ে আয়নাটা নিল।

অন্য মেয়েগুলো রকম সকম দেখে হেসে উঠল।

পরে একদিন ওয়াঙকঙকে জিজ্ঞাসা করলাম

—বান্ধবীর সঙ্গে তো বেশ ঘোরাফেরা কর। বিয়ে করবে কবে?

—করবো। তার আগে কিছুদিন মেলামেশা করে নিই। তোমরা কর না?

—কেউ কেউ করে। উত্তর দিয়েছিলাম।

—আমরা সবাই করি। এতদিন নিশ্চয়-ই লক্ষ্য করেছ।

—শুধুই মেলামেশা কর?

—কী বলতে চাইছি বুঝতে পেরে বলেছিল

—সব কিছুই করি। কোন ঝামেলা হলে বিয়ে তো আছেই। না বিয়ে করে উপায় নেই। যাব কোথায়?

খুব সহজেই কথাগুলো বলেছিল।

—তোমরা না হয় এরকম মেলামেশা করতে পার। কিন্তু সম্পার ঘরের কোন মেয়ে কী পারবে এভাবে ভাব ভালবাসা করতে?

আমার প্রশ্নে একটু যেন থমকে গেল। একবার ভাল করে আমাকে লক্ষ্য করে কী বলতে চাইছি বুঝতে চেষ্টা করল বোধ হয়।

পরে বলল—কেন পারবে না?

বা রে। তোমাদের নিয়ম-ই তো বলছে ওয়াঙহামের মেয়েরা অন্য গ্রামের ওয়াঙহাম ছেলে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারবে না।

—তাতে কী হয়েছে। বিয়ে করতে পারবে না ঠিক। কিন্তু মেলামেশা করতে পারবে না এমন তো কোন নিয়ম নেই। তোমার কী কোন ধারণা আছে এই রকম ছেলে পাওয়ার জন্যে কত বছর কেটে যায়। ততদিন কী কোন মেয়ে ভাব-ভালবাসা করবে না? তারও তো সাধ-আহ্লাদ আছে। একজন নয়, ওয়াঙহামের মেয়ে অনেকের সঙ্গেই মেলামেশা করতে পারে। শুধু নিজেকে একটু সতর্ক থাকতে হয়। কোন রকম অঘটন হলে লজ্জা একটু নিশ্চয়-ই হয়।

মেলামেশায় যে কোন বাধা নেই তা এদের সঙ্গে দু-একদিন মরুঙ থেকে বেরিয়েই টের পেয়েছি। মেয়েরা মরুঙে না এলে কী হবে, ছেলেরা তো রাতের বেলায় মেয়েরা যেখানে থাকে সেখানে চলে যায়।

জমিয়ে আড্ডা দেয় সবাই মিলে। গান হয়। খুনসুটি করে। আর তার মধ্যেই কখনো চালি, কখনো অন্য কিছু, কখনো বা ছোট আয়না দিয়ে ভাল লাগার জনকে মনের কথা বলতে চেষ্টা করে।



bengaliboi.com

এর মধ্যে কোন লুকোছাপা নেই।

এই ওয়াঙকঙকেই কথায় কথায় একদিন বলেছিলাম

—তোমরা ভাগ্যবান।

—হঠাৎ এরকম ভাবছো কেন? প্রশ্ন করেছিল ও।

—তোমাদের মুণ্ডু শিকারের প্রথা শেষ। এখন আর সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয় না কাউকে।

—কথাটা ঠিক। বলেছিল পাশে বসে থাকা দোভাষী।

—কিন্তু আমাদের সমাজ এখনো বিশ্বাস করে মাথা শিকারের সঙ্গে গ্রামের মানুষের ভাল-মন্দ জড়িয়ে আছে।

যদি এর মধ্যে সুযোগ হয় তোমাদের এখনকার মুণ্ডু শিকার দেখিয়ে দেবো।

—এখনো মুণ্ডু শিকার হয়? আমাদের আশ্চর্য না হয়ে উপায় ছিল না।

—হয়। গম্ভীরভাবে বলেছিল দোভাষী। তবে কী রকম হয় তা এখন বলছি না।

বেশি দিন অপেক্ষা করতে হল না। একদিন দোভাষী এসে বলল

—মাথা শিকার কী করে হয় কাল তোমাদের দেখাব।

—চমকে উঠলাম আমরা। কী বলছে এ। সত্যি সত্যিই কী আজকের দিনেও আমাদের মাথা শিকার করা দেখাবে? ইয়ার্কি করছে নিশ্চয়-ই।

ব্যাপারটা সম্পার কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যায়। কিন্তু নানা কাজে কদিন আর সম্পার ঘরে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এখন আর সময়ও নেই। যা দেখার কালই দেখবো।

দোভাষী আমাদের মুখের অবস্থা দেখে নিশ্চয়-ই মনের কথা আন্দাজ করতে পেরেছে। বলল

—দুটো গ্রাম পরে আগামী কাল মাথা শিকারের আচার অনুষ্ঠান হবে। দেখতে চাও তো ভোরবেলায় তৈরি থেকো।

এ রকম সুযোগ কী কোন নৃতাত্ত্বিক হাতছাড়া করে? পরদিন ভোরবেলায় দোভাষীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে।

শীতের ভোর। অল্প অল্প কুয়াশা রয়েছে। ভাল করে রাস্তা ঠাহর করা মুশকিল। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটা সম্ভব নয়। তাই প্রথমেই দোভাষীকে বলে দিলাম

—বেশি জোরে হাঁটতে পারবো না।

পাশাপাশি হাঁটার অসুবিধে বলে চলার সময় ভাল করে কথাও বলতে পারছিলাম না। সরু পায়ে চলা রাস্তার দিকেই মন দিতে হচ্ছিল বেশি।

—হাঁটতে বেশ আরাম লাগছিল। খুব বেশি উঁচু-নিচু নয়। হাওয়ার বেগও খুব একটা জোর নয়।

দোভাষী আগে আগে। মধ্যে দাসবাবু, পেছনে আমি। ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর পৌঁছে গেলাম গন্তব্য স্থানে।

গ্রামটি খুব একটা বড় নয়। পাহাড়ের গায়ে মোটামুটি একশ মতো ঘর আছে।

দোভাষীকে দেখলাম সবাই চেনে। ওর সঙ্গে আমাদের দেখে কেউ খুব একটা আশ্চর্য হল না।



bengaliboi.com

আসলে এই এলাকায় গ্রামে থেকে এতদিন কাজ করছি সে কথা বোধ হয় আশপাশের বেশ কিছু গ্রামের মানুষ-ই জানে। দোভাষী যেখানে নিয়ে গেল সেখানে দেখলাম গ্রামের গোম্পা তার পুজো পাঠ ততক্ষণে সেরে ফেলেছে। সম্পার ছেলেকে সামনে রেখে মরুঙের ছেলেরা সারি দিয়ে হাতে খোলা দা আর বর্শা নিয়ে চুপিসাড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করে এগিয়ে গেল।

দোভাষীর সঙ্গে আমরাও পেছন পেছন গেলাম। প্রচণ্ড কৌতুহল হচ্ছে। এইভাবে কোথায় যাচ্ছে? কার-ই বা মাথা কাটবে এই পরিষ্কার দিনের আলোয়। কিছুদূর এইভাবে যাওয়ার পর একটা কলা গাছের ঝোপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। সামনের ছেলেটি হাত তুলে ইশারা করল। লুকিয়ে পড়ার ভঙ্গি করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সবাই।

অল্পক্ষণ দমবন্ধ করা ভাব। তারপর আমাদের সম্পার কাছে যেমনটি শুনেছিলাম ঠিক সেই মতই সামনের ছেলেটি একটি পাতা এগিয়ে দিল তার পেছনের ছেলেটিকে। সে আবার বাড়িয়ে দিল পরের জনকে। সবাই আমরা উদগ্রীব হয়ে নাটক দেখছি। ততক্ষণে বুঝে গেছি এটিই আক্রমণের আগের মুহূর্ত।

কিন্তু কাকে আক্রমণ করবে? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। পাশে দাঁড়ান দোভাষীকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি সে মুখে হাত দিয়ে চুপ করতে ইশারা করল। ওর চোখ দেখে মনে হল খুব অন্যায় করতে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ-ই প্রাণ কাঁপানো চিৎকারে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। পরক্ষণেই দেখলাম ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সামনের কলা গাছগুলোর ওপর বসিয়ে দিচ্ছে দা-এর ঘা। বিঁধিয়ে দিচ্ছে বর্শা।

এরাই তা হলে শত্রু। ধাতস্থ হলাম। টপাটপ কলা গাছের টুকরো ঝুড়িতে ভরা হয়ে গেল। একজন দেখলাম একটা গোল মতো পাথর তুলে নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ার ভান করল।

এটিই তা হলে মানুষের মাথার প্রতীক!

ফিরে এল সব বিজয়ী লড়াকু।

সমস্ত ব্যাপারটা হতে প্রায় কোন সময়-ই লাগল না। সাজানো নাটকের কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন আছে বলেও বোঝা গেল না। মাথা শিকারের উত্তেজনা কই? ওদের উল্লাসের ভান শুধু চিৎকার ছাড়া কিছু মনে হল না।

এরপরে আবার বসল গোম্পার পুজো। গোল পাথরের মাথা পরিষ্কার করে নিয়ে গিয়ে রাখল মরুঙে। যোদ্ধারা কেউ মরুঙে শুয়ে পড়ল। কেউ বা বসে বসে দা আর বর্শা পরিষ্কারে মন দিল।

—থাকবে না ফিরে যাবে? জিজ্ঞাসা করল দোভাষী।

—যাব মানে? ব্যাপারটাই তো কিছু বুঝতে পারলাম না।

—এ রকম নাটক করার কী অর্থ, কে বলতে পারবে?

—চল। সম্পার ওখানে যাই।

সম্পা তার ঘরেই ছিল। পাঙচাওয়ের সম্পার মত অত লম্বা চওড়া না হলেও, শরীর



bengaliboi.com

স্বাস্থ্য বেশ ভালই। এরও দেখছি গলায় দুটো ছোট্ট কাঠের মাথা ঝুলছে। দোভাষী আমাদের আসার কারণ বলল।

আমরা নমস্কার করলাম।

চাটাই পেতে আমাদের বসতে বলে বলল—তোমরা অনেকদিন এদিকে আছ শুনেছি। কেমন দেখলে আমাদের মাথা শিকার?

—দেখলাম তো ভালই। বললাম আমরা। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলাম না। এরকম কী তোমার প্রায়-ই কর?

—না, প্রায় করা হয় না। আমাদের এখানে তো প্রায় দশ বার বছর পরে করা হল।

—কেন এরকম কর?

আমরা বিশ্বাস করি মরুঙে রাখা মানুষের মাথাগুলোকে সময়ে সময়ে খাবার দেওয়া প্রয়োজন হয়। তাছাড়া যদি মরুঙে মাঝে মধ্যে নতুন করে মাথা না আনা যায়, তাহলে তো আমাদের কারুর ভাল হবে না। মাথাগুলো বহুকাল না খেয়ে থাকলে গ্রামের অমঙ্গল হবে। আজকের দিনে তো আর সত্যি সত্যিই মাথা শিকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের আত্মারা তো আর সেটা বুঝবে না, তাই তাদের সন্তুষ্ট করতে কয়েক বছর ৬.ের আমরা এই রকম মাথা শিকারের অভিনয় করি।

একটু পরেই মরুঙে রাখা মাথাগুলোকে খাবার দেওয়া হবে। চল আমিও যাবো। নরমুণ্ডদের কী করে খেতে দেয় দেখার জন্যে সবাই গেলাম মরুঙে। সমস্ত মাথা তখন নামিয়ে পরিষ্কার করে একে একে তুলে রাখছে ছেলেরা। গোম্পা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছে। সবগুলো সাজানো হয়ে যাওয়ার পরে এল ভাত আর মাংস। প্রত্যেকটি মাথার সামনে অল্প করে রাখা হল। শুধু ভাত-মাংসে তো আর সন্তুষ্ট হয় না কেউ। তাই সঙ্গে দেওয়া হল বিশেষভাবে তৈরি 'জু'।

এর পরে গোম্পা আবার সুর করে কী সব যেন বলল—দোভাষী বুঝিয়ে দিল। ওদের তৃপ্তির সঙ্গে খেতে অনুরোধ করছে গোম্পা। গোম্পার গলা থামল এক সময়।

মরুঙে উপস্থিত সবার যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। ওখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় অনেকটা নিজের মনেই সম্পা বলল

—আর কয়েক বছর পরে হয়ত আমাদের এই পরম্পরার প্রথাও হারিয়ে যাবে। লোকে ভাববে গল্প কথা।

সম্পার গলার স্বরে স্পষ্ট জড়িয়ে আছে হারিয়ে যাওয়া সুদিনের চিনচিনে বেদনা।

মনে মনে বললাম—শুধু এই প্রথা কেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এরকম অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে সমাজ থেকে। এটাই নিয়ম।

মাংস-ভাত না খাইয়ে ছাড়ল না সম্পা।

মরুঙ থেকে ভেসে আসা খামের একটানা ভারি—গঙগঙ আওয়াজ পেছনে ফেলে রেখে সম্পার কাছে বিদায় নিয়ে ডেরায় ফিরতে ফিরতে সূর্যদেব ঢলে পড়লেন পশ্চিমে।



bengaliboi.com

## দশ

সেদিন শীতের পড়ন্ত নরম রোদ পিঠে দিয়ে আমি আর দাসবাবু সম্পার ঘরের দাওয়ায় চাটাই পেতে বসেছিলাম।

সামনে আধ-শোয়া অবস্থায় সম্পা।

এই সময় এই দিকটায় বেশ একটা ঝোড়ো হাওয়া নাগাল্যান্ডের তুয়েনসাঙ অঞ্চল থেকে ধেয়ে আসে। পরনের চামড়ার জ্যাকেট ভেদ করে শরীরে ঢুকে হাড় কাঁপুনি দেয়। আজ সে রকম কোনো হাওয়া নেই রোদটা বেশ উপভোগ করা যাচ্ছে।

সম্পার হাতে আফিম খাওয়ার হুঁকোর মতো বাঁশের যন্ত্র।

আমাদের দু'জনের জন্যেও একটা আলাদা রয়েছে। দু'মাসের বেশি হয়ে গেল এই গ্রামে। শুরুতে নিজেদের মধ্যে যে জড়তা আর আড়ষ্টতা ছিল সেটা এখন আর নেই। এমন কি কালুরও অনেক বন্ধুবান্ধব হয়ে গেছে। সম্পাও বাইরে থেকে আসা অন্য সব লোকের থেকে আমাদের একটু অন্য চোখে দেখে। কিছুটা বা প্রশ্রয় দেয়।

সম্পাকে যত কাছ থেকে দেখছি ততই ভালবেসে ফেলছি। নিজেদের সমাজ আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে বেশ ওয়াকিবহাল। শুধু তাই নয়—নিজেদের সমাজ নিয়ে কথা বলতে কখনো বিরক্ত বোধ করে না। বরঞ্চ আমরা নানা রকমের প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে চাই বলে মনে হয় আমাদের একটু বেশিই স্নেহ করতে আরম্ভ করেছে। এটা বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না।

গ্রামে ঘোরা-ফেরা করার আমাদের অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে।

এমন কি মেয়েদের সঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়ার জন্যেও কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। যদিও এই ধরনের আড্ডাও দোভাষীর মাধ্যমেই করতে হয়। সম্পা বাঁশের চোঙার একদিকে মুখ লাগিয়ে আধবোজা চোখে অল্প অল্প করে টান দিয়ে চলেছে। চোঙার নিচের দিকে কলকের মত একটি বাঁশের টুকরো লাগানো। তার মাথায় গোঁজা রয়েছে আফিমের ছোট্ট এক টুকরো গুলি। হুঁকোর মতো বাঁশের চোঙার মধ্যে থাকা জলের মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া হাল্কা গুড়ুক গুড়ুক শব্দ করে বেরিয়ে আসছে।

আমরাও এতদিনে এইভাবে আফিম খাওয়া শিখে গেছি। অনুসঙ্গ হিসেবে রয়েছে লাল চা। চোঙায় টান দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝেই লাল চায়ে আমরা সবাই চুমুক দিচ্ছি।

শীতের বিকেল। পড়ন্ত রোদ্দুরের সঙ্গে এই আফিমের মৌতাত সারা শরীরকে যেন ক্রমশ হাল্কা করে দিচ্ছে।

সম্পার পাশে এসে বসল তার সব থেকে ছোট-বৌ। কোমরের নিচ থেকে সেই এক চিলতে কাপড়ের টুকরো। শরীরের ওপর দিকে গলা থেকে যে অল্প স্বল্প ঘাসের মালা দুলছে তার ফলে যৌবনের প্রাচুর্যের প্রকাশই বেশি। তার জন্যে অবশ্য না সম্পা, না তার ছোট-বৌ-এর কোন আলাদা করে ভ্রূক্ষেপ আছে।

—আসলে এটাই তো ওয়াঞ্চু সমাজে স্বাভাবিক। তার জন্যে আমাদের অনভ্যস্ত চোখে লজ্জার ছোঁয়া লাগতে পারে।



bengaliboi.com

এই নিয়ে যদি আমরা কোন কৌতূহল দেখাই, তাহলেই এরা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

সম্পা তার আধবোজা চোখে একবার ছোট বৌকে আর একবার আমাদের দেখে নিয়ে বৌকে বলল

—এদের দেখেছ। 'কানি'ও (আফিম) খাচ্ছে আমাদের মতো। আমার একটাই শুধু ভরসা এরা শিলঙে গিয়ে আর 'কানি' পাবে না।

কথাগুলো এমনভাবে বলল যেন আমরা বুঝতে পারি। খুব ভাল লাগল সম্পার আমাদের নিয়ে চিন্তা করতে দেখে। তবু নৃতাত্ত্বিকের সব কিছু থেকেই কিছু না কিছু জানার প্রবণতার জন্যেই বললাম

—জানই যখন 'কানি' খাওয়া ঠিক নয়, তখন এটা গ্রামে বন্ধ করে দাও না কেন?

সম্পা একটু পাশ ফিরে বসল। বলল

—তোমাদের কী মনে হল? তোমরা তো আশেপাশের গ্রামও ঘুরে দেখেছ। কোন তফাত বোঝ নি?

তফাত অবশ্য লক্ষ্য করেছি। এই গ্রামে কম বয়েসি ছেলেদের আমরা আফিম খেতে দেখিনি খুব একটা।

—তবে? আর আমাদের মতো যারা বুড়ো হয়ে গেছে তাদের এত বছরের অভ্যাস ছাড়াতে যাওয়ার কষ্ট করে কী হবে? গ্রামের ছেলেরা আমার সম্মান রেখেছে। কেউই আফিম-এর নেশায় পড়ে নি। সম্পাকে এই জন্যেই এত ভাল লাগে। নিজের গ্রামের মানুষদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে বেশ।

আফিমের গুণে, নাকি পড়ন্ত বেলার নরম রোদের সঙ্গে হাল্কা হাওয়ার ছোঁয়াতে সারা শরীর কেমন রিমঝিম করছে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই। আপ্রাণ চেষ্টা করছি যাতে নেশা না হয়ে যায়। তা হলেই তো আর নৃতাত্ত্বিকের চোখ আর মন কাজ করবে না।

আশেপাশের নরম বাতাবরণের মধ্যে কোথাও যেন কিছু একটা গন্ডগোলের আওয়াজ পেলাম বলে মনে হল। একবার ভাবলাম এ বোধ হয় আফিমের প্রভাব। দাসবাবু কিছু শুনেছেন বলে মনে হল না। লাল চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে বসে আছেন কিছুটা বুঁদ হয়ে। সম্পা কিন্তু দেখলাম উঠে বসল। মুহূর্তের মধ্যে আধবোজা চোখের চাউনি কিছু বোঝার জন্যে সরু তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

সম্পার বৌও উঠে দাঁড়িয়ে সার্কল অফিসের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

এবার সোজা হয়ে উঠে বসল সম্পা। মুহূর্তের মধ্যে যেন তার সমস্ত আমেজ কোথায় উধাও হয়ে সদা সতর্ক 'ওয়াঙ্চু' লড়াকুর চেহারা বেরিয়ে এল। তার চোখ-মুখ, শরীরের প্রতিটি অংশ যেন কিছু একটা গন্ডগোলের আঁচ পেয়ে সমস্ত মৌতাত ক্ষণিকের মধ্যে ঝেড়ে ফেলে সজাগ হয়ে উঠল।

আমরা দুজনেই সম্পার এইভাবে বদলে যাওয়া চেহারা দেখে কখন যেন উঠে দাঁড়িয়েছি। এর-ই মধ্যে রোদের যে অল্প একটু আলো ছিল সেটাও ঝপ করে প্রায় নিভে গেল।

এতক্ষণে স্পষ্ট কটা কথা কানে এল।



bengaliboi.com

—মার শালে কো। খতম কর দেও।

কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম, সম্পার ভাই দৌড়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছে। তার পেছন পেছন দুজন সি আর পি এফ-এর জওয়ান কাঠের ব্যাটন তুলে দৌড়োচ্ছে।

দু-একবার ঘাও মারল সম্পার ভাই-এর পিঠে।

এদের পেছনে সি আর পি এফ-এর উর্দি পরা একজন রাইফেল নিয়ে চিৎকার করছে।

—খতম কর দেঙ্গে শালে কো। আপনেকো সমঝতে হো ক্যা? সমস্ত ঘটনাটা এমন মুহূর্তের মধ্যে হয়ে গেল যে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। সামনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সম্পার মুখ মরুঙে রাখা মাথার খুলির মত ভাবলেশহীন অথচ ভয়ঙ্কর। চোখ দুটিতে কিন্তু নরমুণ্ড শিকারির সতর্কতা।

সম্পার ছোট-বৌ হতবাক হয়ে তার স্বামীর লম্বা শরীরের আড়ালে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম সি আর পি এফ-এর তিনজন ফিরছে। এদের একজন হুকুম করা ভঙ্গিতেই বলছে—ফির আগর কোই হমারা ছাউনিকা তরফ যায় তো কিসিকো ছোড়না নেহি। মারকে খাল খিঁচ লেনা। শালা নাঙ্গা লোক আপনেকো সমঝতা ক্যা? কথাগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আমাদের সকলেরই কানে এল।

ওরা তিনজন সার্কল অফিসের পাশে মিলিয়ে গেল। আমাদের চার জনের মধ্যে অনেকক্ষণই নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল। এবার সেটা যেন বরফ শীতল হয়ে অন্ধকারের সঙ্গে জমাট বেঁধে গেল।

এই মুহূর্তে কী করবো, কী বলবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

সম্পাই এবার আমাদের বলল—তোমরা এখন চলে যাও। আজকে আর গ্রামের বাইরে যেও না।

কথাগুলো অতি স্পষ্ট, কাটা কাটা, অনেকটা হুকুমের মত শোনাল।

ঝড়ের আগে থমথমে আবহাওয়ায় দূর থেকে গুড় গুড় করা মেঘের গর্জনের মত। অনুগত বাধ্য প্রজার মত আমরা দুজন মরুঙের দিকে পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম।

আমাদের দুজনের মুখেই কোন শব্দ নেই। পাশাপাশি হাঁটছি।

তুয়েনসাঙ থেকে আসা ঠাণ্ডা হাওয়া হঠাৎ-ই আরো ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগল। শরীরের ভেতরে কেমন একটা শিরশির করে কাঁপুনি দিতে শুরু করল।

দাসবাবু নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বললেন—কী হল বলুন তো?

ব্যাপারটা খুব একটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

—আমারও খুব একটা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না।

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। দেখলেন না সম্পা গ্রামের বাইরে যেতে বারণ করল।

মরুঙে ফিরে এসে দেখলাম কালু লণ্ঠন জ্বালিয়ে একা খাটে শুয়ে আছে।

অন্যান্য দিন এই সময়ে বেশ কয়েকজন ছেলে মরুঙে এসে পড়ে। আবছা অন্ধকারে কথাবার্তা ঘোরাফেরা করে।

কালুর কাছে দু'চার জন খাসিয়াদের গল্প শোনে। আমাদের সমাজে যেমন পুরুষরা সম্মান পায় ঠিক সেইরকম খাসিয়া মেয়েরা তাদের সমাজে প্রতিপত্তি দেখাতে পারে শুনে



bengaliboi.com

কখনো বা ওরা সমবেতভাবে জানতে চেয়েছে তাহলে পুরুষরা কী করে? ঘর সংসার সামলায়?

কালুকে নিয়ে মাঝে মধ্যে কিছুটা রসিকতাও করেছে। কালু অভিযোগ করেছে আমাদের কাছে। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছি। বলেছি এদের ওপর রাগ কোর না। ওরা তোমার বন্ধুর মত হয়ে গেছে। একটু আধটু ঠাট্টা করলে সেটা হালকা ভাবেই নিও। কদিন পরেই তো চলে যাবো।

আজ কালুকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম

—তোমার বন্ধুরা সব এখনো এল না। কী ব্যাপার?

কালু আমাদের দেখে উঠে বসে বলল

—বুঝতে পারছি না।

অন্যদিন বাচ্চাগুলোতো এই সময় এসে যায়। এত চুপচাপ আর কাঁহাতক থাকা যায়। তাই শুয়েছিলাম। পরে বলল

—আর কতদিন আমাদের থাকতে হবে? প্রায় আড়াই মাস তো হয়ে গেল।

আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা। কালুর কথার জবাব না দিয়ে শুধু বললাম—দেখি।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে এমনিতেই সমস্ত গ্রাম অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। কোন দিক থেকেই কোন রকম আলোর দেখা পাওয়া যায় না। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই ভয় ধরানো নিস্তব্ধতা জড়িয়ে থাকে সারা গ্রামে।

মরুঙ-এর মধ্যে ছেলেদের কথাবার্তা গান, কখনো কখনো তার সঙ্গে হালকা 'খাম' বাজনার ছন্দ শুনতে পাই। রাতটা সেই জন্যে তেমন অসহনীয় মনে হয় না।

এখানে আসার সেই প্রথম দিন থেকেই এই পরিবেশে থেকে এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আজকের এই ব্যতিক্রম তাই মনের মধ্যে কেমন একটা উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।

আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় কোন একটা অশুভ আশঙ্কা করছে। কোন রকমে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে আজকের ডায়েরি লিখতে বসলাম।

কোন কিছুই ঠিক মতো গুছিয়ে লিখতে পারছিলাম না। থেকে-থেকেই বিকেলে দেখা সম্পার পাথর কঠিন মুখ আর তীরের ফলার মত চোখের দৃষ্টি মনে পড়ে যাচ্ছিল। রাত্রি ন'টা নাগাদ দশ-বার জন ছেলে এল।

ওদের ঢুকতে দেখে কিছুটা স্বস্তি পেলাম।

অন্যদিনের মত কিন্তু ওদের মধ্যে কোন উচ্ছলতা দেখলাম না।

ওরা আমাদের দিকে এলোও না।

আবছা আলোয় ওদের মুখগুলোও দূরে রাখা মাথার খুলিগুলোর মত নিস্পৃহ মনে হল। আমাদের থাকার জায়গা থেকেই ওদের চলা-ফেরা লক্ষ্য করতে থাকলাম। বুঝতে চেষ্টা করলাম ওদের মনোভাব। আজকে আর কোথাও বসল না ওরা। 'খামের' দু'পাশে সার দিয়ে দাঁড়াল।

প্রত্যেকে হাতে তুলে নিল ড্রাম বাজানোর মুগুরের মত কাঠের টুকরোগুলো। তারপর এক সঙ্গে আঘাত করল 'খামে'।



bengaliboi.com

সারা মরুও যেন কেঁপে উঠল গুমগুম আওয়াজে। অন্য দিনের মত ধীর, নরম ছন্দ নয়। এই শব্দে শরীর দুলে ওঠে না নাচের ছন্দে। কেমন যেন উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয় রক্তের মধ্যে। বাজনার শব্দ দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকল। কিন্তু কখনই তার গাম্ভীর্য নষ্ট হল না।

প্রায় আধ ঘণ্টা এই রকম বাজনা বাজানোর পরে ওরা থামল।

কিন্তু কেউই শুয়ে পড়ল না।

আমাদের এখান থেকে আগুন নিয়ে গিয়ে ছোট্ট একটু আগুন জ্বালালো।

আমরা তিনজন সম্মোহিত মানুষের মত ব্যাপারটা দেখলাম, উঠে গিয়ে যে ওদের সঙ্গে কথা বলব, বা ওদের কোন প্রশ্ন করব তারও ক্ষমতা তখন হারিয়ে ফেলেছি।

কিছুক্ষণ পরে ওরা বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে শুধু বলে গেল—কাল সকালে গ্রামের বাইরে যেও না।

—কেন যাব না, সে কথা জিজ্ঞাসা করার মত সময়ও দিল না।

ওদের এই আদেশ আমাদের তিনজনের বুকেই ভারি পাথরের মতো চেপে বসল।

হ্যারিকেনের অল্প আলোয় দূরে সাজিয়ে রাখা উননব্বইটি মাথার খুলির দিকে আপনা থেকেই চোখ চলে গেল। এতদিন এদের যেভাবে দেখেছি আজ যেন হঠাৎ অন্য রকম মনে হল। ওরা সবাই বোধ হয় আমাদের তিন জনের ওপর নজর রেখেছে। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে আমাদের অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা। হয়তো ওদের মধ্যে থেকে হঠাৎ কেউ বলে উঠবে

—আমাদের সংস্কৃতি জানতে এসেছ, তার কিছুটা আঁচ তো পেতেই হবে।

—আমরা তোমাদের অপেক্ষায় রইলাম।

আর কিছু ভাবতে পারলাম না। চোখ বন্ধ করলাম।

—সরকার। বহুদূর থেকে কেউ যেন ডাকল। চোখ খুলতে ইচ্ছে করছিল না।

—সরকার! আবার ডাক শুনলাম।

দাসবাবুর গলা। এত কাছ থেকে ডাকছেন অথচ মনে হচ্ছে যেন কত দূর থেকে ডাকটা ভেসে আসছে।

—বলুন। চোখ খুললাম।

—আমার কিন্তু বিকেল থেকে যা হচ্ছে, কোন কিছুই ভাল ঠেকছে না। দাসবাবুর গলার স্বর স্পষ্টই ভয় মেশানো।

আমি টিমের লিডার। এই সময় যদি আমি সাহস না দিই সেটা আমার পক্ষে ঠিক হবে না।

বললাম—আমিও যে খুব ভাল কিছু মনে করছি তা নয়। বিকেলে যে ঘটনাটা ঘটল তা যে ঠিক কী কারণে হল তা জানি না। এর নিশ্চয়ই একটা 'এফেক্ট' হবে। তবে যেভাবে সম্পা আর এই ছেলেগুলো আমাদের গ্রামের বাইরে যেতে বারণ করল তাতে মনে হয় না আমাদের কোন দুর্ভাবনার কারণ আছে।



bengaliboi.com

কালু আমাদের দু'জনের কথা ঠিকমত বুঝতে না পারলেও আন্দাজ করতে পেরেছে গ্রামে একটা গণ্ডগোল হয়েছে। হঠাৎই বলল—অরুণাচলের এত জায়গা থাকতে এই মাথা শিকারিদের গ্রামে কেন যে আপনারা কাজ করতে এলেন। আমি প্রথম দিনই বলেছিলাম এখানে থেকে কাজ নেই। মরুঙে না থেকে যদি সার্কল অফিসের কোন ঘরে থাকতাম তা হলে তো এই রকম অসহায় হয়ে থাকতে হত না। এরা এখন যা চাইবে, আমাদের নিয়ে তাই করতে পারবে।

কালুকে একটু মৃদু ধমক দিলাম। বললাম

—আমরা যতক্ষণ এদের গ্রামের মধ্যে আছি ততক্ষণ কোন ভয়ের কারণ নেই। একথা আগেও বলেছি, এখনও বলছি। আমাদের শুধু সম্পা যা বলে সেই অনুযায়ী চলতে হবে।

দাসবাবুর উদ্দেশে বললাম—নৃতাত্ত্বিক হিসেবে কিন্তু আমাদের সমস্ত পরিস্থিতি ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত।

—চিন্তা করবেন না। সব ঠিক থাকবে। বললাম বটে, কিন্তু মন থেকে আশঙ্কার ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। মনের এই টালমাটাল অবস্থার মধ্যেই কখন যেন একটু ঘুমের ঘোর এসে গিয়েছিল।

হঠাৎই ঘোরটা ভেঙে গেল। আমাদের ঘিরে যেন অনেক মানুষ ফিসফিস করে কথা বলছে। না স্বপ্ন নয়। চোখ খুলতেই অল্প দূরের মাথার খুলিগুলোর দিকে নজর গেল। আধো ঘুমে আধো জাগরণে একবার ভাবলাম এরাই হয়তো কথা বলছে। পরক্ষণেই মরুঙের ভেতরে অনেকের চলাফেরার শব্দে নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। ভাবলাম ভোর হয়ে গেছে বোধ হয়। বালিশের নিচ থেকে ঘড়ি বের করে হ্যারিকেনের আলোয় দেখলাম—সাড়ে তিনটে বাজে।

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে পড়ে গেল সম্পা একদিন বলেছিল

—ওয়াঙচুরা অন্যদের আক্রমণ করতে যাওয়ার এইটাই সব থেকে ভাল সময় মনে করে।

অল্প আলো অল্প আঁধারে লুকিয়ে থেকে আচমকা আক্রমণ করতে সুবিধে হয়। তবে কী অতীত দিনের সেই রকম আক্রমণের ঘটনা ঘটতে চলেছে?

কিন্তু কাকে আক্রমণ করতে এই প্রস্তুতি?

সমস্ত চিন্তাই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। স্পষ্ট দেখলাম এদের অনেকের হাতেই বন্দুক। সকলের কোমরেই লম্বা দা, যা প্রয়োজনে চোখের নিমেষে ধড় থেকে মুণ্ড আলাদা করে দিতে পারে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা কোন রকম শব্দ না করেই সারিবদ্ধ হয়ে একে একে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকার জড়ানো স্তব্ধতা নিমেষের মধ্যে সমস্ত মরুঙ-এর ভিতরটা ছেয়ে গেল।



bengaliboi.com

ছেলেরা সবাই ভোর রাত্রে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে আমরা আর কেউ ঘুমোতে পারি নি। ক্যাম্পখাট থেকে পাশ ফিরে বারেবারে হাত ঘড়িতে নজর করেছি। সকাল হওয়ার অপেক্ষায় থেকেছি।

আজকের সকালটাও অন্য দিনের থেকে আলাদা। সমস্ত গ্রাম ঘন কুয়াশায় ঢেকে গেছে। শীতকালের এই সময় অরুণাচলের এই অঞ্চলের কুয়াশা যাঁরা দেখেন নি তাঁদের ঠিক বলে বোঝানো যাবে না এর ঘনত্ব। নিজের শরীরেরই সব অংশ প্রায় ঠিকমত ঠাহর করা যায় না।

কুয়াশার সঙ্গে চলেছে একটা ঝোড়ো হাওয়া। ঘর থেকে বের হতে ইচ্ছে করছে না। অথচ প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা রয়েছে বাইরে কী ঘটছে জানার জন্যে। স্থির হয়ে দু'দণ্ড বসতেও পারছি না। গ্রামের মধ্যে থেকে কোন সাড়া শব্দও পাচ্ছি না।

এরই মধ্যে বার দু-এক চা খাওয়া হয়ে গেছে। কী করবো স্থির করে উঠতে না পেরে দাসবাবুকে বললাম

—এভাবে ঘরের মধ্যে বসে থাকার যন্ত্রণার থেকে বাইরে ঘুরে আসাই ভাল।

—কিন্তু এরা যে আমাদের বাইরে যেতে বারণ করেছে। যাওয়াটা কী ঠিক হবে? দাসবাবু সতর্ক করে দিতে চাইলেন।

—আমরা তো গ্রামের বাইরে যাচ্ছি না। সম্পার ওখানে গেলে কোন ঝামেলা হবে না বলেই মনে হয়। বললাম আমি।

—ওখানে কালকের ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু জানাও যেতে পারে। গ্রামের ভেতর দিয়েই তো যাব। কেউ আপত্তি করলে ফিরে আসবো। চলুন বলে, ঝোলা, নোট বই নিয়ে উঠে পড়লাম।

কালু বলল—আমিও যাবো।

বুঝলাম একা থাকতে চাইছে না। কিন্তু ওকে নিয়ে সম্পার ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না।

বললাম—না, তুমি এখানেই থাকো। আমরা বেশিক্ষণ থাকবো না। চলে আসবো।

কালুর পছন্দ হল না নিশ্চয়ই আমার নির্দেশ। মুখ ভার করে থাকল।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম সকালের ঘন কুয়াশা হালকা ফিকে হয়ে এসেছে। সূর্যের আলো কুয়াশা চুঁইয়ে নেমে আসতে পারছে। রাস্তা দেখার অসুবিধে হচ্ছে না।

ঘড়িতে তখন সাড়ে দশটা বাজে।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে দু'জনে ইতিউতি দেখতে দেখতে এগিয়ে গেলাম। অন্য দিনের মতো আশপাশ থেকে সাড়া শব্দ পেলাম না। কাউকে দেখতেও পেলাম না।

সম্পার ঘরের সামনে এসে অন্যদিনের মতোই ডাকলাম

—সম্পা ঘরত আছ নাকি?

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাথা একটু ঝুঁকিয়ে দরজার বাইরে বেরিয়ে এল সম্পা। আমাদের দেখে শান্তভাবেই বলল—আহক।



bengaliboi.com

বাইরে তখনো কুয়াশা রয়েছে। হাওয়া বইছে।

বলল—ভিতরত বহক।

আমরা দু'জনেই ওর পিছন পিছন ঘরে ঢুকলাম।

এই ঘরের ভিতরটা খুব একটা অন্ধকার নয়। ঘরের ভেতরে আগুন জ্বলছে। আমরা দু'জনে বসার জন্যে দুটো 'টুল' টেনে নিলাম। সম্পা তার নির্দিষ্ট চেয়ারেই বসল।

আমি সম্পার মুখ খুব ভাল করে লক্ষ্য করছিলাম। কালকের বিকেলের সেই কাঠিন্য' দেখা যাচ্ছে না। তবে চোখ দুটিতে বেশ গভীর চিন্তার ছাপ রয়েছে বলে মনে হল।

—কালি মরুঙত ভয় পায় নাই তো?

অল্প একটু হাসির ভাব মুখে এনে সম্পা জিজ্ঞাসা করল।

—কিয়? যেন সে রকম কিছু হয় নি ভাব এনে বলতে চাইলাম। তবুও নিজেরই গলায় যে শঙ্কার ভাব জড়িয়ে আছে তা খট করে কানে বাজল।

হঠাৎই সম্পার গলা বেশ ভারি আর গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—কালি যে ঘটনাটি হোল্ তা ভাল ন হয়।

দাসবাবু এবার বললেন—কী হইছে, আমি এতিয়াও গম পোওয়া নাই।

—কালি ত আপনি চালে মোর ভাইয়ক সি আর পি এফ-এর জওয়ান গাঁওর ভিতর মারিলে। আমার গাঁওয়র ভিতরত মোক না জানাই আহিলে। ধমক দিলে। গাঁওর মানু এটু ভাল্ পোওয়া নাই। আমার সমাজর নিয়ম এনেকা নাহয়। আপনি আমার সমাজ নিয়ম নীতি চাবলই ইয়াতে ইমান দিন থাকিলে। বাহিরর মানু যদি আমার গাঁওর ভিতর আমার নিয়ম নষ্ট করে তাক্ কেনেকা ক্ষমা করিম? এরপর সম্পা কালকের বিবরণ দিল

—গ্রামের তিনটি ছেলে সি আর পি এফ-এর ক্যান্টিনের কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। ওরা প্রায়ই যায়। সকলেই চেনা পরিচিত। ফষ্টি-নষ্টি করে। আবার চলে আসে। গতকাল সি আর পি এফ-এর একজন ক্যাপ্টেন ডিব্রুগড় থেকে কয়েকদিনের জন্যে এসেছেন। এখানে ডিউটিতে থাকা জওয়ানের মাইনে দিতে।

আমাদের তিনটে ছেলেকে ক্যান্টিনের পাশে উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে ওদের কোন খারাপ মতলব আছে বলে সন্দেহ করে। ওদের শুধু লেংটি পরা অবস্থায় দেখে বেশ কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করে। অসভ্য বাঁদরের জাত বলে গালাগালিও দেয়। একজনকে থাপ্পড় মারে। গালাগালি হিন্দিতে দিলেও আমার ছেলেদের তা বুঝতে অসুবিধে হয় নি। আচমকা এ রকম ব্যবহারে ওরাও অসম্ভব রেগে যায়। কিন্তু নিজেরা কিছু না করে গাঁয়ে এসে ভাইকে জানায়। আমার হয়ে ভাই গাঁয়ের অনেক কিছু দেখা শোনা করে। সার্কল অফিসে, হাসপাতালে সবাই ভাইকে চেনে। ও তাই নিয়ম মত সার্কল অফিসারকে জানাতে যায়। সার্কল অফিসার এখানে না থাকায় ও সি আর পি এফ-এ চলে যায়। সেখানে ঐ ক্যাপ্টেনের কাছে প্রতিবাদ জানাতে গেলে উনি কোন কিছু শোনা তো দূরের কথা উল্টে ওকে উচিত শিক্ষা দেবে বলে শাসায়। শুধু তাই নয়, আবার আমাদের নাঙ্গা অসভ্য জানোয়ার বলে গালাগালি দেয়। ওকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। আমরা লড়াকু ওয়াঙ্চু। অপমান করলে তা হজম করে নিই না।



bengaliboi.com

ভাই যখন ক্যাপ্টেনের কথার প্রতিবাদ করে তখন উনি চিৎকার করে তাঁর জওয়ানদের ভাইকে লাঠি দিয়ে মারতে বলেন।

তারপর তো তোমরা নিজেরাই দেখলে ওরা গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে মারল। খুন করব বলে শাসাল। এর বদলা তো নিতেই হবে। কাল তাই সবাইকে ডেকে আমি ঠিক করেছি ওকে শাস্তি দেব।

—কী করবে? এবার সত্যি সত্যিই বেশ একটু ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

সম্পা আমাদের মনের ভাব বুঝতে পারল। বলল—এই মুহূর্তে ঐ সি আর পি এফ-এর সমস্ত এলাকা আমাদের লোকেরা ঘিরে রেখেছে। ক্যাপ্টেন যাতে পালাতে না পারে।

কালকে রাতে মরুঙে 'খাম' বাজিয়ে আশেপাশের গ্রামের সমস্ত পুরুষকে ভোর রাত্রের মধ্যেই যার যা হাতিয়ার আছে নিয়ে এখানে জড়ো হতে খবর পাঠিয়েছিলাম। দেখেছ নিশ্চয়ই মরুঙে সবাই সেই মতো হাজির হয়েছিল। আমাদের লোকেরা এখান থেকে খনসা যাওয়ার রাস্তাও সারা রাত ধরে পাথর আর গাছ ফেলে পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। পালাবার কোন রাস্তা খোলা নেই। বাইরে থেকেও কেউ সাহায্য করতে আসতে পারবে না। কথাগুলো সম্পা খুব ঠাণ্ডা ভাবেই বলছিল।

এবার কিন্তু আমরা দুজনেই নিজেদের আশঙ্কা লুকিয়ে রাখতে পারলাম না। প্রায় একসঙ্গেই দাসবাবু আর আমি বললাম—আমরাও আটকে গেলাম। কী যে হবে!

সম্পা একটু হেসে অভয় দিয়ে বলল—তোমাদের কোন ঝামেলা নেই। শুধু বেশি ঘোরাফেরা করবে না।

—আমরা কী সার্কল অফিসের দিকেও যাবো না? পরে যাতে কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয় তার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম।

—তা যাবে না কেন? তবে সি আর পি এফ-এর ঐ দিকে না যাওয়াই ঠিক হবে। সার্কল অফিসের ওই দিকের লোকজনদের কাছ থেকে যে ঘটনা ঘটল তার সম্বন্ধে মতামত জানার প্রয়োজন ছিল। তাই যখন সম্পার অনুমতি পেলাম তখন আর দেরি না করে উঠে পড়লাম। বললাম

—ঐ দিকটা একটু ঘুরে আসি। পরে আবার আসবো। এখন তো মনে হয় গ্রামের সবাইকে আমাদের কাজের জন্যে ঠিক মত পাবোও না।

—দু-একদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অভয় দিল সম্পা। তোমরাও দেখ না ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

সম্পার ওখান থেকে বেরিয়ে সার্কল অফিসে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় বারোটা বাজে। কুয়াশার লেশ মাত্র নেই। রোদ বেশ ভালই উঠেছে। যদিও ঠাণ্ডা হাওয়ায় রোদের তেজ বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

সার্কল অফিসে গিয়ে দেখলাম কারুর কোন ব্যস্ততা নেই। যে চার পাঁচজন কর্মচারি বসে আছেন সকলেরই মুখে কী হয় কী হয় ভাব।

মিঃ মেগা না থাকায় প্রশাসনের কাজ দেখতে হচ্ছে ডাঃ চৌধুরীকে। আমরা ওঁর হেল্‌থ সেন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। জানলা দিয়ে আমাদের দু'জনকে দেখে চৌধুরী



bengaliboi.com

নিজেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন—আসুন, আসুন। আপনাদের জন্যে মহা দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

চৌধুরী সাহেবের ঘরে ঢুকে দেখলাম ক্যাপ্টেন রাও বসে আছেন। ঐখানেই বড়ুয়া মশাইও রয়েছেন।

আমরা দুজনে দুটি চেয়ারে বসলাম। এদের সকলের মুখে একবার চোখ বোলালাম। সবাই যেন আমাদের মুখ থেকে অনেক কিছু শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন।

—দুশ্চিন্তা কেন? ডাক্তারের কথার রেশ টেনে জিজ্ঞাসা করলাম।

—কী বলছেন মশাই। সকাল থেকে এত ঘটনা ঘটে গেল, আপনারা দুজন গ্রামের ভিতরে পড়ে আছেন, দুশ্চিন্তা হবে না?

—কী আবার ঘটল। একটু আগে সম্পার কাছে যা শুনেছিলাম তা সম্পূর্ণ চেপে গিয়ে কিছুই না জানার ভান করলাম। বস্তুত যাতে কোন রকম ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে না পড়ি তার জন্যে সম্পার ঘর থেকে বেরিয়েই আমরা দুজনেই ঠিক করেছিলাম গ্রামের মধ্যের পরিস্থিতি নিয়ে এদের সঙ্গে যতদূর সম্ভব কম আলোচনা করবো।

ক্যাপ্টেন রাও মনে হল আমার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন

—সি আর পি এফ-এর ক্যাপ্টেন সহায় কালকে গ্রামে একটা ঝামেলা করেছেন সেটা তো জানেন।

— জানি। দুজনেই ঘাড় নাড়লাম।

—আজকে ভোর থেকে সি আর পি এফ-এর ক্যাম্প ওয়াঙ্চুরা হাতিয়ার নিয়ে ঘিরে রেখেছে সেটাও নিশ্চয়ই জানেন। আমি একবার দাসবাবুর দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন রাও-এর কথার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে বললাম

—ভোর রাত্রে গ্রামে অনেক মানুষের আনাগোনা দেখেছি। কিন্তু ঠিক কী কারণে তা বুঝতে পারি নি।

—আজকে ভোরে সি আর পি এফ-এর ক্যান্টিনে ওরা আগুন লাগিয়েছে।

এবার ডাঃ চৌধুরী বললেন

—খনসা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা বাইরের জগৎ থেকে এখন পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। এখানে ১৪৪ ধারা লাগাতে হয়েছে।

—না, গ্রামের মধ্যে থেকে এ সব কিছুই টের পাওয়া যায় নি। তবে সিরিয়াস কিছু যে একটা ঘটেছে তা আন্দাজ করতে পারছিলাম। গ্রামের লোকেরা আমাদের বাইরে বেশি ঘোরাফেরা করতে বারণ করেছে।

—আমি কিন্তু কাল রাত্রেই আঁচ করতে পেরেছি। ওদের বাজনার আওয়াজ যখন পাহাড়ের একদিক থেকে আর একদিকে ধাক্কা খেয়ে ফিরছিল, আর সেটা শেষ হওয়ার আগে আবার অন্যদিক থেকে বেজে উঠছিল তখনই বুঝেছি ক্যাপ্টেন সহায়ের ঘটনার জের সহজে মিটবে না। বললেন ক্যাপ্টেন রাও।

—উঃ, আমি এখানে তো প্রায় পাঁচ বছর আছি। এর আগে কখনো এ রকম প্রাণ জল করা ঐ বাজনা শুনি নি। কথাগুলো বলার সময় বড়ুয়া মশায়ের চোখে মুখে ফুটে উঠল



bengaliboi.com

সেই ভয়ানক আওয়াজ শোনার মুহূর্তের ছবি। এর মধ্যেই চা দিয়ে গেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে ক্যাপ্টেন রাওকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কেমন বুঝছেন? ক্যাপ্টেন রাও-এর বয়স খুব বেশি হলে তিরিশ হবে। চোখ মুখ বেশ বুদ্ধিদীপ্ত।

উনি বললেন দেখুন, এর মধ্যে আমাদের আর্মির কিছু করার নেই। পুরোটা সিভিলিয়ানদের ব্যাপার।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যাপারটা কীভাবে হ্যান্ডেল করে তার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। আদিবাসীরা কিন্তু প্রমট্ অ্যাকশন নিয়েছে। এদের যে যে গ্রামে সি আর পি এফ-এর জওয়ানদের ডিউটি ছিল সেখান থেকে সবাইকে আজ ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। কারুর কিন্তু কোন ক্ষতি করে নি। ইচ্ছে করলেই পারতো। শুধু বলেছে—তোমরা এখানে থাকলে তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারবো না। সবাই এরই মধ্যে ফিরে এসেছে।

এই খবরটাও আমার কাছে নতুন। সকলের মুখের দিকে বেশ গর্বের সঙ্গেই তাকালাম। মনে মনে বলতে চাইলাম দেখ তো এই অর্ধ উলঙ্গ মানুষও কতখানি সংযম ধরে।

—আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন সহায় ঠিক কাজ করেন নি। বললেন ডাঃ চৌধুরী। আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বুঝি না। কিন্তু এটা তো বুঝি এই রকম একটা স্ট্র্যাটেজিক পজিশনে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডারের গায়ে থাকা গ্রামে কোন কিছু করতে হলে অনেক ভেবে চিন্তেই করা উচিত। মেগা এখানে নেই। মেসেজও পাঠিয়েছি। কিন্তু আসবে কোথা দিয়ে? এখন যত হ্যাপা সামলাতে হবে আমাকে। সাতদিন পরে ডিব্রুগড়ে যাওয়ার ছুটিও পেয়েছি। কী যে হবে!

—কী আর হবে। আপনার বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দিতে হবে। অল্প একটু রসিকতা করেই বললেন ক্যাপ্টেন রাও।

—এই খবরটা তো দেন নি মশাই। দাসবাবু আর আমি দুজনেই ডাঃ চৌধুরীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—কনগ্র্যাচুলেশন!

—আর কনগ্র্যাচুলেশন। হতাশা চেপে রাখতে পারলেন না ডাঃ চৌধুরী।

—ক্যাপ্টেন সহায়কে আমারই প্রচণ্ড শাস্তি দিতে ইচ্ছে করছে। বেশ উত্তেজিত হয়েই বললেন উনি।

কথায় কথায় প্রায় দুটো বেজে গেছে। ওধারে কালু নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি ফিরবো বলে এসেছি।

এদেরও খাওয়ার সময় হয়েছে। সবাই উঠে পড়লাম।

ডাঃ চৌধুরী বিশেষ করে বললেন—আসবেন মশাই। কথা বলেও মনে যদি একটু সাহস পাই। সকাল থেকে খনসার অ্যাডভাইস চেয়েছি। ওরা শুধু বলছেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আসলে কী জানেন ওরাও ইটানগরের অর্ডার-এর অপেক্ষায় আছে। এদিকে ক্যাপ্টেন সহায় বারবার বলছেন—ফায়ারিঙ অর্ডার দাও। সবাইকে শায়েস্তা করে দেব। আমি মশাই ডাক্তার মানুষ। রোগী নিয়ে কারবার। পাকেচক্রে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দেখতে হচ্ছে। আমি কোথা থেকে দেব ফায়ারিঙ অর্ডার? আর কেনই বা দেব? ক্যাপ্টেন রাও তো আমাকে এই ধরনের কোন অ্যাকশন নিতে বারণ করেছেন।



bengaliboi.com

বুঝতেই পারছেন মনের অবস্থা। সবাই মিলে বসে একটু কথা বললেও মনে সাহস পাওয়া যায়।

বেরিয়ে যেতে যেতে বললাম—অবশ্যই আসবো। আমাদেরও তো একই অবস্থা।

বেরিয়ে এসে দাসবাবু বললেন—কালকে রাত থেকে এত সব ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ আমরা প্রায় কিছুই জানি না। এখন থেকে দু'বেলাই এদের কাছে আসতে হবে।

গ্রামের মধ্যে দিয়ে ফেরার সময় বাইরের উত্তেজনার কোন আভাস পেলাম না।

কালু সত্যি সত্যিই উতলা হয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

মরুঙে ঢুকে প্রথমেই ওকে সাহস দিয়ে বললাম—সম্পার সঙ্গে কথা বলেছি। ভয়ের কিছু নেই বলেছে। নিশ্চিন্তে থাক। স্নান খাওয়া দাওয়ার পর সারাদিনে আর বের হলাম না।

সন্ধ্যের দিকে কয়েকটি বাচ্চা এল কিছুক্ষণের জন্যে। বড়দের কাউকেই দেখা গেল না। বাচ্চারাও কিছুক্ষণ পরেই চলে গেল।

আবার সেই আলো আঁধারি আর নীরবতার অসহ্য যন্ত্রণা।

ডায়েরি খুলে সারাদিনে যা যা শুনলাম আর দেখলাম লিখতে বসলাম দুজনে।

## বারো

আজকের সকালের রোদ বেশ ঝলমলে। হাওয়ার বেগও গতকালের মতো নয়। গতকালের অসহ্য মানসিক অবস্থাও আজ নেই। বেশ হালকাই লাগছে নিজেকে। মনে হচ্ছে সম্পা ঠিকই বলেছে গতকাল।

—এই পরিস্থিতিতে নৃতাত্ত্বিক হিসেবে সকলের ব্যবহার লক্ষ্য আর বিশ্লেষণ করলে এদের সমাজ ব্যবস্থার একটা অন্য দিকও জানা যাবে।

গ্রামের মধ্যে অসাধারণ শান্ত ভাবই বলে দেয় এ ঝড়ের পূর্বাভাস। কী ঘটতে যাচ্ছে ঘুণাক্ষরেও তা প্রকাশ করতে চায় না এরা।

বাচ্চা আর মেয়েরা মোটামুটি অন্যান্য দিনের মতই ঘোরাফেরা করছে।

গতকাল না দেখলেও আজ দেখলাম মেয়েরা অন্য দিনের মতোই সারি দিয়ে টুকরিতে লম্বা বাঁশের চোঙা নিয়ে জল আনতে বেরিয়ে পড়েছে।

ঘরের মধ্যে থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে কোথাও কোথাও।

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে অনুমান করে সম্পার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

সম্পা আজ রোদে বাইরেই বসেছিল। হয়তো বা আমাদের আসার কথা ভেবেই বাইরে চাটাইও পাতা ছিল।

জয় হিন্দ বলে সম্বোধন করে আমরা দুজনে চাটাই-এ বসলাম। সম্পা তার চেয়ারেই বসে থাকল।

—আজকে তো গ্রামে কোন পুরুষ মানুষ পেলাম না। আমাদের কাজ করবো কী করে। দাসবাবু কথা শুরু করলেন।



bengaliboi.com

—কেন মেয়েদের সঙ্গে কোন কাজ নেই তোমাদের? রসিকতার সুরে বলল বুঝলাম।

—আছে তো। কিন্তু তার জন্যে তো দোভাষী দরকার। আর কতদিন এই রকম চলবে? তোমাদের তো আগেই বলেছি সমস্তটাই ওদের ওপর নির্ভর করছে। ঐ ক্যাপ্টেনকে আমাদের হাতে তুলে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সেটা কী সম্ভব? আমি সন্দেহ প্রকাশ করলাম।

—সম্ভব-অসম্ভব জানি না। ইটানগর থেকে বলেছে ক্যাপ্টেনের বিচার ওরা ওদের নিয়মে করবে। আমি রাজি হই নি। বলেছি ও আমাদের অমর্যাদা করেছে গ্রামের ভিতরে ঢুকে। কাজেই ওর বিচার আমাদের রীতি অনুযায়ী হবে। তারপর হঠাৎই বলল—তোমরা তো আমাদের নিয়ে বই লিখবে বললে, সে কী এইসব বাইরের মানুষ, যারা এখানে আসে তারা পড়বে?

—অতি সাধারণ অথচ খুবই কঠিন প্রশ্ন। কী করে বলি আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে আমাদের লেখা পড়ার এদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উত্তরটা সোজা না দিয়ে বললাম—পড়া তো উচিত।

সম্পা যেন আমার উত্তরের কোন অপেক্ষা না করেই নিজের মনেই বলল—আমাদের অপমান করলে কী হয় তা নিনু গ্রামের মানুষরা বহুদিন আগেই দেখিয়ে দিয়েছে।

বললাম—নিনুর সঙ্গে তোমাদের তো কোন বন্ধুত্ব নেই।

—তাতে কী হয়েছে? বলল সম্পা। শত্রু হলেও আমাদের সমাজের নিয়ম তো একই।

সম্পা খুব ভাল বক্তা। অতীতের ঘটনাও বেশ বিস্তারিত ভাবে বলে তার প্রমাণ আগেই পেয়েছি। গত দু'দিন কোন কাজ করতে পারি নি। তাই নতুন কিছু তথ্য পাওয়ার আশায় জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছিল নিনুতে?

সম্পা চোখ বন্ধ করে যেন সমস্ত ঘটনাটা ভাল করে দেখে নিতে চাইল।

ইতিমধ্যে সম্পার বৌ তিনটে বাঁশের চোঙা ভর্তি 'জু' নিয়ে আমাদের তিনজনের হাতে ধরিয়ে দিল। আস্তে করে জিজ্ঞাসা করল—ভাল্?

মাথা নেড়ে জানান দিলাম সব ভালই।

সম্পা চোখ খুলে 'জু'তে বেশ লম্বা একটু চুমুক দিল। একটু সময় নিয়ে বলল—প্রায় একশ বছর আগের কথা। বাইরের মানুষের আনাগোনা তখন এই দিকে ছিলই না। সেই সময় ওয়াঙ্চু গ্রামে গ্রামে একটা কথা ছড়িয়ে পড়ল—বেশ কিছু বাইরের মানুষ অনেক যন্ত্রপাতি নিয়ে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমাদের এলাকায় এইভাবে বাইরের মানুষের ঘোরাফেরা কেউই ভাল চোখে দেখছিল না। কিন্তু তারা যেহেতু আমাদের গ্রামের মধ্যে কখনো ঢোকে নি তাই কেউ তাদের বাধাও দেয় নি। আসলে সেটা ছিল একটা সার্ভে পার্টি। ক্যাপ্টেন ব্যাজলে আর লেফটেন্যান্ট হোলকম্ব সার্ভে করতে এসেছিল। সঙ্গে ছিল সাহেব, আসামের মানুষ আর কিছু নেপালি। তাদের কাছে ছিল লাঠিসোটা আর বন্দুক।

সমস্ত ওয়াঙ্চু অঞ্চলের মানুষ এদের চলাফেরার ওপর কড়া নজর রাখছিল। মনে মনে তৈরিও হচ্ছিল বোধ হয় বাধা দেওয়ার জন্য।



bengaliboi.com

সার্ভে পার্টি ঘুরতে ঘুরতে তিসা নদী পার হয়ে নিনু গাঁয়ের কাছে সুমইয়ানুক বলে একটা জায়গায় তাদের তাঁবু ফেলল।

নিনুর মানুষ সবই লক্ষ্য করছিল। কোন উচ্চবাচ্য করল না। ভাবটা যেন কিছুই হয় নি।

ঐ সময় গাঁয়ের প্রধান দিঙওয়াঙ মারা গিয়েছিল। আমাদের নিয়ম মতো তার দেহটা একটি উঁচু জায়গাতে শোয়ানো ছিল। সমস্ত গাঁ তখন শোক পালন করছে। তোমরা নিশ্চয়ই এতদিনে জেনেছ ঐ সময় মৃতের শরীর ছোঁয়া নিষেধ। গাঁয়ের প্রধানের মৃতদেহ ছোঁয়া বা তাকে কোন রকম অসম্মান করার কথা কেউ চিন্তাই করতে পারে না। গাঁয়ের পাশে সার্ভে পার্টির লোকেদের তো আমাদের নিয়ম জানা নেই। জানা থাকলে আজ এই গল্প তোমাদের শোনাতে হত না।

কথাগুলো একনাগাড়ে বলে সম্পা একটু থামল। বাঁশের চোঙা থেকে লম্বা করে 'জু'তে একটা চুমুক দিল।

—'জু'-এর প্রভাব আমাদের মাথাতে তখন পড়তে আরম্ভ করেছে। আমি যেন সম্পার গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাচ্ছিলাম সেই তিসা নদীর ধারে না দেখা নিনু গাঁয়ে।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি দিঙওয়াঙের নিথর শরীর উঁচু বাঁশের মাচাতে শোয়ানো। এই মানুষটাই হয়তো বেশ কয়েকজনের মাথা কেটে এনে গাঁয়ের প্রধানের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তার প্রিয় লম্বা দা-টা শরীরের পাশে মাচাতে ওরা রেখে দিয়েছে। তার সম্মানে গ্রামের সমস্ত কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। চাষ-বাসের জমিতেও কেউ যাচ্ছে না। গাঁয়ের প্রধানকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আশপাশের বন্ধু-গাঁ থেকে বিশেষ পোশাক পরে কাঁধে নিজেদের তৈরি বন্দুক রেখে মুরগী বা শুয়োর নিয়ে লোক আসছে। সেগুলো প্রধানের শরীরের পাশে উৎসর্গ করছে এক এক করে। ওরা একে একে মৃতের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায় মাথা নামিয়ে বিড় বিড় করে কত কী বলছে। মহিলারা দল বেঁধে মৃতদেহ ঘিরে কাঁদছে। পুরুষদের কেউ কেউ বন্দুকের নল উঁচিয়ে আকাশের দিকে 'ফায়ার' করছে। সম্বিত ফিরে পেলাম সম্পার কথায়।

—সার্ভে পার্টির কিছু লোক গাঁয়ে ঢুকে আমাদের মেয়েদের নিয়ে খারাপ মন্তব্য করছিল, বাজে অঙ্গভঙ্গীও করেছে কেউ কেউ। ছেলেদের কাউকে কাউকে হাতের লাঠি দিয়ে খোঁচাও মেরেছে ক'য়েকবার। তবু যেহেতু গাঁয়ে শোক চলছিল কেউ কিছু বলে নি। কিন্তু মনে মনে সবাই ফুঁসছিল।

ঘুরতে ঘুরতে সার্ভে পার্টির কিছু লোক দিঙওয়াঙ-এর শরীরের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। মৃতদেহ বাঁশের ওপর যেভাবে রাখা ছিল বা তার আশেপাশে যে সব জিনিস উৎসর্গ করেছিল তা দেখে এদের কেউ কেউ নাক সিঁটকে ছিল। দু-একজন ঠাট্টাও করেছিল। একজন তো তার লাঠি দিয়ে মৃতের শরীরে খোঁচাও দিয়ে বসে তাচ্ছিল্য দেখাতে।

—খোঁচা দিল! আমরা দুজনেই শিউরে উঠলাম।



bengaliboi.com

—হ্যাঁ। খুব ধীর গলায় বলল সম্পা। খোঁচা দিল। আর সেই সঙ্গেই সে আর তার সঙ্গীদের মরণও নিজের অজান্তেই ডেকে আনল।

খোঁচা দেওয়ার ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে পাহাড়ের আগুনের মতো গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। মরুঙের 'খাম'-এর আওয়াজ এই অভাবনীয় ঘটনার কথা সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিল এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে। বন্ধু গাঁয়ের যোদ্ধাদের ডাক দিল সবাই মিলে এসে এর যোগ্য জবাব দিতে।

রাতের অন্ধকারে সম্পার মরুঙে বসল মিটিং। অন্যদের সঙ্গে সার্ভে পার্টির দু'জন দোভাষীকেও ডাকা হল। এদের একজন 'নকতে' আর একজন আমাদের ওয়াঙ্চু।

অন্ধকারের মধ্যে সম্পার গম্ভীর প্রশ্ন ভেসে এল তোমরা দুজন বাইরের লোকের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ওরা এই রকম অসামাজিক কাজ করল কী করে?

ঘটনা ঘটার সময় তোমাদের দুজনেই ওদের সঙ্গে ছিলে। অন্যেরাও সম্পার কথার প্রতিধ্বনি করল—আমাদের সমস্ত নিয়ম তোমাদের জানা থাকা সত্ত্বেও ওরা এ রকম দুঃসাহস কী করে করল ভাবতেও পারছি না। দোভাষী দুজনেরই ততক্ষণে শরীর হিম হয়ে এসেছে। বুঝতে পেরেছে যে কোন মুহূর্তেই তাদের মাথা দুটো ধড় থেকে নেমে আসতে পারে। মরুঙে সাজিয়ে রাখা মানুষের খুলি আরো দুটি হয়তো বেড়ে যাবে।

দুজনেই শেষ রক্ষা করার চেষ্টায় প্রবলভাবে হাত-পা নেড়ে জানাল—দুষ্কৃতিরা কেউই আমাদের কথা মানে নি। গ্রামের ভিতরে আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও তারা ঢুকেছে। তারা যা করেছে তা শুধু গাঁয়ের মানুষদেরই অপমান করা হয়েছে তাই নয়, এর জন্যে সকলের সঙ্গে আমরাও মনে গভীর আঘাত পেয়েছি। সেই জন্যেই আমরা সার্ভে পার্টির তাঁবুতে আর যাই নি। জমায়েত সকলের মনের অবস্থা আঁচ করেই ওরা দুজনেই বলল—তোমাদের সকলের মতো আমরাও চাই এই অভব্যতার উচিত শাস্তি হোক।

মিটিঙে সবাই দোভাষী দুজনের কথায় যুক্তি আছে মনে করল। তা ছাড়া তারা সকলেই তখন উপযুক্ত শাস্তি যত তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় তার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। দোভাষী দুজনের মুখ থেকে তাদের মনের কথা শোনার পরের মুহূর্তে স্থির হল—উপযুক্ত জবাব দিতে হবে।

জবাব আর কী হবে। দোষী প্রত্যেকের মাথা নিয়ে এসে মরুঙকে আরো সমৃদ্ধ করা হোক। এদের মাথার খুলি দেখে আগামী দিনে কেউ আর যেন আমাদের সংস্কৃতির অপমান করার মতো ধৃষ্টতা দেখানোর সাহস না পায়।

দোভাষীদের গাঁয়ের মধ্যেই থাকতে বলে তারা ক্যাম্প আক্রমণের ছক কেটে ফেলল।

পাহাড়ের কোল থেকে রাতের অন্ধকার তখনো বিদায় নেওয়ার বেশ কিছু সময় বাকি। তারা ঝলমলে আকাশের মোলায়েম আলোর মধ্যেই সার দিয়ে সবাই বেরিয়ে গেল।

এতগুলো উত্তেজিত মানুষ লড়াই করতে বেরিয়ে গেল কিন্তু সাড়া শব্দ পেল না কেউ। সবাই যেন হাওয়ায় ভেসেই এগিয়ে গেল।

সার্ভে পার্টির তখনো কেউ জেগে ওঠে নি। শুধুমাত্র একজন পাহারাদার কাঁধে রাইফেল নিয়ে ক্যাম্প পাহারা দিচ্ছে। ওয়াঙ্চু লড়াকু পুরুষরা তখন ছক মাফিক সমস্ত ক্যাম্প ঘিরে ফেলেছে।



bengaliboi.com

তাদের হাতের দা নিশপিশ করছে। আক্রমণের ইশারা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর ওপর।

মাথা শিকারের এত ভাল পরিস্থিতি তাদের উৎসাহ আরো বাড়িয়ে দিল। মাথা নিতে পারলে আশেপাশের মানুষের কাছে সম্মান বেড়ে যাবে।

লড়াই-এর ছক অনুযায়ী একজন পাহারাদারের বেশ কিছু দূরে গিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকল যাতে একটু আলো ফুটলেই তাকে দেখা যায়। ভোরের আলো ফুটে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাম্পের পাহারাদার একজন প্রায় উলঙ্গ মানুষকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল।

গতকালের যে ঘটনা ঘটে গেছে তার ফল যে কী হবে তা ক্যাম্পের মানুষ বা পাহারাদারের জানার কথা নয়। তবু পাহারাদার কাঁধে রাইফেল নিয়ে দূর থেকেই সজোরে হাঁক দিল—কৌন হ্যায়?

ভোরের নিস্তব্ধতা চুরমার করে আওয়াজ পাহাড়ের আনাচে কানাচে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল।

আশেপাশের গাঁয়ের মানুষ মাঝে মাঝেই কৌতূহলী হয়ে ক্যাম্পের কাছে আসে। দূর থেকে দেখেই চলে যায়। পাহারাদার সেই রকমই কেউ এসেছে ভেবে আর একবার চক্কর দেওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

পিছন থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াঙচু একটু গলার আওয়াজ তুলে বলল—আমি পাশের গাঁয়ের সম্পা। তোমাদের লোকের সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু তোমার কাঁধের বন্দুক দেখে কাছে যেতে সাহস পাচ্ছি না।

ইতিমধ্যে ব্যাজেল সাহেব উঠে পড়েছেন। হোলকম্ব সাহেবও উঠে পড়েছেন। বাইরে কথা শুনে হোলকম্ব পাহারাদারকে ডাকলেন।

পাহারাদার জানাল—একজন প্রায় নাঙ্গা লোক এসে বলছে সে পাশের গাঁয়ের সম্পা। সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

হোলকম্ব সাহেব বুঝিবা একটু আশ্চর্যই হলেন। সাত সকালে একজন জঙ্গলী তাঁর সঙ্গে কেন দেখা করতে এল মাথা মুণ্ডু বুঝে উঠতে পারলেন না। কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললেন—তা দেখা করতে এসেছে যখন আসতে দাও।

পাহারাদার একটু হেসে বলল—লোকটা আসতে ভয় পাচ্ছে।

—কেন? হোলকম্ব আবার বিস্মিত হলেন।

পাহারাদার তার রাইফেলটা দেখিয়ে একটু গর্ব ভরেই বলল—এর জন্যে।

হোলকম্ব সাহেবও হেসে ফেললেন। বললেন যাও ওটা সরিয়ে রেখে দিয়ে লোকটাকে নিয়ে এস।

তাঁবুর বাইরে একপাশে রাইফেল রেখে পাহারাদার দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে কাছে আসতে বলল। দূর থেকে পাহারাদারের চলাফেরা সমস্তই লক্ষ্য রাখছিল গাঁয়ের মানুষটি। নিজেকে সম্পা বললেও আসলে কিন্তু সে সম্পা ছিল না। এটাও লড়াই-এর একটা ছক। রাইফেল সরিয়ে রাখায় যেন আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মুখের ভাব সেই



bengaliboi.com

রকম শক্ত সমর্থ পুরুষটি আস্তে আস্তে তাঁবুর দিকে এগিয়ে এল। চোখ তার কিন্তু পাহারাদারের ওপর থেকে এক লহমার জন্যেও অন্যদিকে যায় নি।

পাহারাদারও এই রকম একজন পুরুষকে তার রাইফেলকে ভয় পেতে দেখে মনে মনে বুঝিবা কৌতুকও বোধ করছিল। হোলকম্ব সাহেবের তাঁবুতে ঢোকার ঠিক আগে পাহারাদারের সামান্য একটু অন্যমনস্কতার সুযোগ নিল লড়াকু যুবক।

মুহূর্তের মধ্যে তাঁবুর গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা রাইফেল চলে এল তার হাতে। অন্য হাতে বেরিয়ে এল তার সব সময়ের সঙ্গী লম্বা দা।

হোলকম্ব সাহেবের সঙ্গে অন্য সবাই চমকে উঠলেন সকালের পাহাড়ি নিস্তব্ধতা খানখান করে দেওয়া হুঙ্কারে। শত্রুদের আক্রমণ করার সংকেত পাঠিয়ে উল্লাসে লাফিয়ে উঠল ছেলেটি।

চোখের নিমেষে, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎই যেন মাটি ভেদ করে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল এক ঝাঁক মানুষ। প্রত্যেকের হাতে বিশাল বিশাল দা। চোখে মুণ্ড শিকারের উল্লাস, সঙ্গে মিশে আছে তাদের মৃত প্রিয় সম্পার অসম্মানের প্রতিশোধ স্পৃহা।

হোলকম্ব তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তেই তার পিছন দিক থেকে মাথায় নেমে এল দা-এর মোক্ষম আঘাত। একবার নয়, পরপর দুবার।

হোলকম্ব সাহেব চিরতরে শুয়ে পড়লেন পাহাড়ের কোলে। ভয়ার্ত মানুষগুলো যে যে দিকে পারল দৌড়াতে আরম্ভ করল।

কিন্তু পালাবে কোথায়? সমস্ত দিক থেকেই তো তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে।

সকালের রোদ লম্বা লম্বা দা-এর ওপর পড়ে মাঝে মাঝেই ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

একের পর এক মানুষের মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। একদল পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নেমে তিসা নদীর পাশ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করল।

সবই বৃথা। নিনুর মানুষ সেখানেও তাদের রেহাই দিল না।

তবে কিছু লোক জঙ্গলে লুকিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

এতগুলো মাথা শিকারের ঘটনা ওয়াঙ্চুদের মধ্যে আর কখনো হয় নি।

আমরা সম্পার মুখের দিকে প্রায় সম্মোহিত হয়েই তাকিয়ে ছিলাম।

এই রকম একটা নারকীয় ঘটনা সম্পা যেন কেমন তারিয়ে তারিয়ে বর্ণনা করছিল।

মুণ্ড শিকারের কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। মুখে কিছুটা উল্লাসের আভাও ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছিল কখনো বা।

সম্মোহিত ভাব কাটিয়ে দাসবাবুই প্রথম কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কতজনের মাথা গেল?

—প্রায় আশিটার মতো। সম্পার গলার স্বরে স্পষ্ট গর্বের ছোঁয়া। চমকেই উঠলাম। আশিজন লোকের মাথা কাটা গেল সাধারণ একজনের অজ্ঞতার জন্যে। মৃত সম্পার শরীরে খোঁচা না দিলে তো এ সব কিছুই হত না।

সম্পা যেন ঘোরের মধ্যেই বলল—এই একটা দিনেই নিনুর সম্পা সমস্ত ওয়াঙ্চু গাঁয়ের মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠল।



bengaliboi.com

আমাদের মতো 'শত্রু' গাঁয়েও তার নাম ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

—সার্ভে পার্টির ওপর এই আক্রমণের জন্যে নিশ্চয়ই তখনকার সরকার নিনুর মানুষদের শাস্তি দিয়েছিল। দাসবাবু জানতে চাইলেন।

তা দিয়েছিল। নিনু কেন, আশপাশের অনেক গ্রামই পুড়িয়ে ফেলে তারা। গুলি করে মারে বেশ কিছু, ধরেও নিয়ে যায় অনেককে।

কিন্তু তাতে কী এসে যায়?

নিনুর মানুষ প্রতিশোধ প্রিয় ওয়াঙ্চু হিসেবে সেই দিনই সবার ওপরে জায়গা করে নিয়েছে।

আমাদের সমাজে এ এক অসাধারণ পাওনা। অনেকটা নিজের মনেই বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল সম্পা। মনে হল এই নস্টালজিয়ার মধ্যে এখন কিছুক্ষণ থাকতে ভালবাসবে সম্পা। তাই আর সময় নষ্ট না করে আবার আসবো বলে উঠে পড়লাম। সম্পা বাধা দিল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে দাসবাবুর মুখের দিকে ভাল করে তাকালাম। ওনার মুখেও আমার মত চিন্তার রেশ।

—কী বুঝলেন? জিজ্ঞাসা করলাম।

—কিসের কী? ব্যাপারটা যেন ঠিক পরিষ্কার নয় দাসবাবুর কাছে।

—সম্পা যে ঘটনা শোনালো তার নিশ্চয়ই একটা উদ্দেশ্য আছে। বললাম আমি।

—তা তো আছেই। আপনি বোধ হয় খেয়াল করেন নি। সম্পা তো বলেই ছিল তাদের কালচার না জেনে গাঁয়ে ঢুকে মৃতের অসম্মান করার জন্যেই ঐ রকম একটা বীভৎস ব্যাপার ঘটে যায়।

—তার মানে গতকাল এখানে যা ঘটেছে তাও এদের কালচারের অবমাননা বলতে চাইছে।

—কিন্তু সে রকম তো কিছু দেখলাম না। বললেন দাসবাবু। আমিও ঠিক সেই মুহূর্তে বুঝে উঠতে পারছিলাম না কোথায় এদের কালচারে আঘাত করল সি আর পি এফ-এর ক্যাপ্টেন।

কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে কোন অসুবিধে হল না সমস্ত ব্যাপারটা বেশ ঘোরাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বেশ চিন্তিত হয়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে ফিরছিলাম নিজেদের ডেরার দিকে। ভালও লাগছিল এই প্রায় অশিক্ষিত মানুষগুলির নিজের সমাজ আর সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠা দেখে। এটাই তো সব আদিবাসীর আসল শক্তি।

মনে পড়ে গেল লোহিত জেলার দিবাঙ ভ্যালিতে 'আদি'দের মধ্যে কাজ করতে যাওয়ার আমার প্রথম দিনের কথা। শিক্ষায় দীক্ষায় অরুণাচলের অন্য অনেক আদিবাসীদের থেকে অসাধারণ এগিয়ে গেছে। এদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়র এমন কী সিভিল সার্ভিসের মানুষও আছেন।

এদেরই একটি বেশ বড় গ্রামে মাস দু'য়েকের জন্যে ক্যাম্প করে কাজ করব বলে



bengaliboi.com

যেদিন হাজির হলাম গাঁওবুড়া আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বলল—তুমি তো আমাদের গ্রামে দু'মাস থাকবে বলছো। আমরা তোমার থাকার ব্যবস্থা 'মসুপ'-এ করবো। তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

যতদিন আমাদের গ্রামে থাকবে অতিথি হয়েই থাকবে। তোমার যে ধরনের কাজ বলছ তাতে তোমাকে ছেলে আর মেয়ে সবার সঙ্গেই মেলামেশা করতে হবে।

তোমার বয়স কম। বিয়ে করেছ কী?

—না। এখনো সুযোগ হয়ে ওঠে নি।

—মসুপ-এ কিন্তু সন্ধ্যেবেলা থেকেই গান, বাজনা, পনুম নাচ সব শুরু হয়ে যায়। বলল গাঁওবুড়া।

—আমাদের মেয়েরা কিন্তু তোমাকে এই সব নাচ গানে ভাগ নেওয়ার জন্যে টানাটানি করবে। আমরা কিন্তু কেউ বাধা দেবো না। সেটা আমাদের রীতি নয়।

ওরা জোর করে 'আপঙ' খাওয়াবে। আরো অনেক রকমের উৎপাতও করতে পারে। তুমি আমাদের সমাজকে জানতে এসেছ। এগুলো তারই অঙ্গ।

এই ব্যবহারের অন্য অর্থ করতে যেও না। এর সুযোগ কিন্তু অন্যভাবে কখনই নেওয়ার চেষ্টা করবে না। সে রকম কিছু ঘটলে আমিই কিন্তু প্রথমে 'কেবাঙ' ডেকে আমাদের রীতি অনুযায়ী তোমার বিচার করে শাস্তি দেবো। কেউ আটকাতে পারবে না।

গাঁওবুড়া কী বলতে চাইছে বুঝতে অসুবিধে হয় নি। আমি শুধু একটা কথাই বলেছিলাম—আমি নৃতাত্ত্বিক। আমার কাজ তোমাদের কাছ থেকে শেখা। এর বাইরে কিছু চিন্তাই করতে পারি না। তবে একটা বিষয় আমার কাছে কেমন অদ্ভুত লাগছে।

—কী? প্রশ্ন করেছিল গাঁওবুড়া।

—তোমাদের 'আদি' সমাজ সব দিক দিয়েই অসাধারণ উন্নতি করেছে। তবু তোমরা 'মসুপ'-এর মতো এমন একটা জিনিস এখনো রেখে দিয়েছ কেন বুঝতে পারছি না। শুধু রেখেই দাও নি বলছ সন্ধ্যেবেলা নানা রকমের অনুষ্ঠানও ঐ 'মসুপ'কে ঘিরে হচ্ছে।

এটা কী পিছনের দিকে ফিরে যাওয়ার সামিল নয়? গাঁওবুড়া আমার বোধবুদ্ধির দীনতা দেখে বোধ হয় একটু বিস্মিতই হল। বলল

—পিছনের দিকে যাওয়ার কথা আসছে কোথা থেকে?

যদি আমাদের রীতি-নীতির চর্চা না করি, পূর্বপুরুষের রীতি সব ছেড়ে দিই তা হলে নিজস্ব পরিচিতি আর কী থাকবে? আমাদের তো কোন অস্তিত্বই থাকবে না। মসুপ-এই ছেলেমেয়েরা সমাজের নিয়ম কানুনের শিক্ষা পায়। সমাজকে ভালবাসতে শেখে। মসুপের কাজকর্ম কিন্তু কখনই এগিয়ে যেতে বাধা দেয় না। কথাগুলো ঠিক এই রকম যে গুছিয়ে বলেছিল তা নয়। তবে ভাবটা ঠিক এই রকমই ছিল।

নিজের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অরুণাচলের অন্যতম অগ্রসর আদিবাসীদের একজনের চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পার চিন্তা-ভাবনায় অসাধারণ মিল খুঁজে পেলাম। নিজের অজান্তেই নতুন করে সম্পাকে শ্রদ্ধা জানাতে আমার মাথা আপনা-আপনিই কিছুটা ঝুঁকে গেল।



bengaliboi.com

## তের

আজ চারদিন হয়ে গেল সি আর পি এফ-এর এলাকা ঘিরে রয়েছে ওয়াঙ্চুরা।

গতকাল রাত্রিতেও মরুঙ-এ কোন যুবক আসে নি। নিশ্চয়ই এরা কড়া পাহারা দিতে সবাই ব্যস্ত। অথচ কোন গণ্ডগোলও আর হয় নি।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলতে পারে?

গ্রামের মানুষজনকে দেখলে মনে হয় না এরা এ সব নিয়ে চিন্তিত। যত চিন্তা আমাদের মতো যারা বাইরে থেকে এসেছে।

খনসা থেকে এ বিষয়ে কোন খবরাখবর এল কিনা জানতে আজ সকালেই চলে গেলাম ডাঃ চৌধুরীর ওখানে। রাস্তা বন্ধ থাকায় মিঃ মেগা এখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পারেন নি।

ডাঃ চৌধুরী আমাদের দেখে খুশিই হলেন। সামনের চেয়ার দুটি টেনে বসতে দিয়ে কাঞ্চাকে চা দিতে বলে কিছুটা হতাশার সুরে বললেন—আজ চারদিন হয়ে গেল কোন মীমাংসাই হল না।

—মীমাংসা তো এখন আপনার হাতে। দাসবাবু রসিকতা করে বললেন।

—খনসা থেকে ডি সি তো আমাকে বলছেন রাজার সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে।

—তা বলছেন না কেন? জানতে চাইলাম আমরা।

—ডাঃ চৌধুরী মুখ করুণ করে বললেন—চেষ্টা কী করি নি ভাবছেন। গত তিন দিনে কয়েক বারই বললাম মিটমাট করে নিতে।

রাজা কিন্তু একই কথা বলে যাচ্ছে।

—কী বলছে?

—মশাই এই ধরনের ইন্টারন্যাশানাল বর্ডারে যারা থাকে তারা কিন্তু খুব সহজ পাত্র নয়। বার বার বলছে ওদের গাঁয়ে রাজার অনুমতি ছাড়া ঢুকে ওদের মানুষকে মেরেছে গালাগালি করেছে, এতে নাকি ওদের কালচারে দারুন আঘাত লেগেছে।

তারপরে মুখ একটু বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন

—আপনারা তো দেখছেন এদের কালচারের ছিরি। এখনো পর্যন্ত সবাই জামা কাপড় পরতেই শিখল না, তার আবার কালচারের বড়াই।

নৃতাত্ত্বিক হিসেবে কথাগুলো একেবারেই ভাল লাগল না। যদিও বুঝতে পারছিলাম ভদ্রলোক অসহায় অবস্থায় পড়ে এই ধরনের মন্তব্য করছেন, তবু বললাম

—পৃথিবীর সব কালচারেরই কিন্তু নিজের বিশেষত্ব আছে। কোন কালচারই ছোট বা বড় নয়। ঠিক মতো জামা কাপড় পরা শেখে নি এই কথাটা এখানে অনেকের মুখেই শুনছি। আর সেই জন্যে এদের কালচার আমাদের থেকে খারাপ বলে অনেকেই মনে করি, ওরাও তেমনি হয় তো কোন কারণে আমাদের কালচারকে ওদের থেকে খারাপ বলে ভাবতেই পারে।



bengaliboi.com

—আপনারা তো বলবেনই। আপনাদের এইসব মানুষ নিয়ে কারবার। দিব্যি কেমন মরুঙে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এদের সব কিছু তো আপনাদের ভাল বলতেই হবে।

—তা ঠিক নয়। তবে কোন সমাজের মানুষ যখন তার সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে তখন তাদের ভাল না লেগে উপায় নেই।

ইতিমধ্যে বড়ুয়া মশাই এসে বসেছেন। উনি বললেন

—যাই বলুন, এদের আমরা মাথায় তুলে রেখেছি। তা না হলে চার দিন ধরে সমস্ত এলাকা বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে দিয়ে কী করে পার পেয়ে যায় বলুন তো? ইচ্ছে করলেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর্মি দিয়ে শায়েস্তা করতে পারে। কিন্তু করবে না। বড়ুয়া মশাই-এর গলায় বেশ ঝাঁঝালো ভাবের টের পেলাম।

—কেন? প্রশ্ন করলেন দাসবাবু।

—এদের অপছন্দের কিছু হলেই বলবে বর্ডারের ওপারে গ্রাম শুদ্ধ চলে যাব। আমি এইসব মানুষদের হাড়ে হাড়ে চিনি।

এরকম ঘটনা কী কখনো ঘটেছে? জানতে চাইলাম।

—ঘটেছে কী মশাই। আমি তো ভুক্তভোগী।

—কী রকম? বড়ুয়াকে আরো একটু উসকে দিয়ে ওনার অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইলাম।

—চৌধুরী সাহেব জানেন। আমি তখন প্রথম চাকরি নিয়ে লোহিত জেলায় এসেছি। তেজুতে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে রিপোর্ট করতে গিয়ে শুনলাম আমাকে লোহিত জেলারই তখনকার আনিনি সাব ডিভিশন-এর একটা গ্রামের স্কুলে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। দিন দশেক হাঁটতে হবে।

মন মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাবলাম—কাজ নেই চাকরিতে। ঘরে বসে চাষবাস দেখাশোনা করে কাটিয়ে দেবো। আবার একবার ভাবলাম—দেখেই আসি না জায়গাটা। চাকরি তো যে কোন সময়ে ছেড়ে দিতে পারি।

বিশ্বাস করবেন না দশদিন হাঁটলাম। প্রতিদিন সকাল থেকে হেঁটে বিকেলে হল্ট করতাম। এখানের বাঁশের ঝুপড়ি রেস্ট-হাউসে। সঙ্গে পোর্টার। রান্নাবান্না করে ওরাই খাওয়াতো। পাহাড়ে হাঁটতে কষ্ট হলেও হঠাৎ হঠাৎ যখন একটা বিশাল ঝরণা সামনে এসে যেত তখন মনে হত সমস্ত ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল। মনে হত ঘণ্টার পর ঘণ্টা এর সামনে বসে থাকা যায়।

সকালে দূরে পাহাড়ের চূড়ায় বরফে যখন রোদ পড়ে চারদিক চকচক করে উঠত তখন কিন্তু চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে পড়তো না।

—অরুণাচল সত্যিই সুন্দর। প্রায় ফিস ফিস করে বললাম।

—মশাই, কত যে অর্কিড দেখেছি তার ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু সারাদিনের ভাললাগা সন্ধ্যে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় উবে যেত।

কোথা থেকে আচমকাই টুপ করে নেমে আসত অন্ধকার।



bengaliboi.com

উঃ, সে কী ভয়ানক ঘন কালো অন্ধকার মশাই।

পাহাড়ি নদীর ধারের রেস্ট হাউসগুলোতে কখনো কখনো আমার মতো দু' একজনকে পেয়ে যেতাম। তা না হলে সারা রাত্রি নদীর গর্জন পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে কেমন যেন একটা ভয় ধরানো পরিবেশ সৃষ্টি করতো। এর সঙ্গে যখন নাম না জানা পোকা-মাকড়, আর কখনও কখনও এখানকার বাঁদরগুলোর আওয়াজ শুরু হত নিজেই নিজেকে গালাগালি দিতে ইচ্ছে করত। হাঁটা শেষ করে যেদিন আনিনি হয়ে আমার নির্দিষ্ট গাঁয়ে পৌঁছলাম তখন কী দেখলাম জানেন?

—কী? আমরা দুজনেই প্রশ্ন করলাম।

—গ্রাম বলতে গোটা পাঁচেক লম্বা লম্বা চালা ঘর।

গাঁওবুড়ার ঘরের সামনে গিয়ে আমার সঙ্গী পোর্টার হাঁক দিতেই বেরিয়ে এল লেংটি পরা গায়ে লাল কোট চাপানো একজন। তখনো জানতাম না লালকোট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে দেওয়া হয়।

—আমার সঙ্গী মিশমি ভাষায় বুঝিয়ে দিল আমি কে।

মাস্টার মশাই জেনে গাঁওবুড়া খাতির করে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসাল। ওদিকের ঘরগুলো বোধ হয় জানেন রেলের লম্বা ফার্স্ট ক্লাস কামরার মতো। একদিকে লম্বা সরু যাতায়াতের জায়গা আর পাশে ছোট ছোট খুপরি।

ওই লম্বা করিডোরের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে সাজান মিথুন, শুয়োর আর গরুর মাথার খুলি।

—এখানকার মত মানুষের নয়। ফোড়ন কাটলেন দাসবাবু। কথার উত্তর না দিয়ে বড়ুয়া বলে চললেন

—গাঁওবুড়া আমাকে ছোট্ট একটা চালা ঘরে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিল এটাই আমার থাকার জায়গা। একটা বাঁশের মাচা রয়েছে শোয়ার জন্যে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা জড়ো হয়ে গেল।

এদের মধ্যে দু'টি ছেলেকে দেখিয়ে বলল—এরাই এবার তোমার ছাত্র। গত এক বছর ধরে আমরা মাস্টার পাঠানোর জন্যে বলছিলাম। কাজ হয় নি। এবারে যখন সাফ জানিয়ে দিলাম—মাস্টার না পাঠালে গ্রাম নিয়ে পাশের দেশে চলে যাব তখনই কাজ হল। তোমাকে পাঠাল।

ওর কথা শুনে আমার তখন এমন রাগ হচ্ছিল পারলে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম। কিন্তু তা তো আর সম্ভব নয়। তাই নিজের ওপরই রাগ আর বিরক্তি নিয়ে গুম হয়ে থাকলাম।

একবার ভাবলাম কালই ফিরে যাবো। কিন্তু আবার সেই দশদিন হাঁটতে হবে চিন্তা করেই সমস্ত উৎসাহ উবে গেল।

কবে শেষ পর্যন্ত চলে এলেন?

—নাঃ। চলে আসতে আর পারলাম কই? সারা দিনরাত ওদের মধ্যে থাকতে থাকতে কখন যেন প্রথম দিনের ঐ প্রচণ্ড হতাশা আর বিরক্তির রেশ কেটে গেল।



bengaliboi.com

—ওখানেই তিনটে বছর কাটিয়ে দিলাম। বড়ুয়া আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন।

দরজার কাছে সার্কল অফিসের বড়বাবুর গলা পাওয়া গেল। মেসেজ আছে স্যার।

—সবাই উৎসুক হয়ে উঠলাম খবর জানার জন্যে।

—খনসা থেকে সম্পার সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে। ওখান থেকে একস্ট্রা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার গুরুং সাহেবকে পাঠানো হবে কথা বলার জন্যে।

—ডাঃ চৌধুরী খবরটা পড়ে শোনালেন।

উঠতে উঠতে বললেন—যাই। বড়বাবু আপনিও চলুন।

—আপনারা যাবেন নাকি? আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন।

—আপনাদের মধ্যে এই মুহূর্তে আমাদের যাওয়া কী ঠিক হবে? আমি ইতস্তত করলাম।

—না থাক। বললেন ডাঃ চৌধুরী। এমনিতে গিয়ে কোন লাভ হবে না। এরা তো কারুর সঙ্গে কথাই বলতে চাইছে না।

—এবার বোধ হয় রাজি হবে। বড়বাবু আশ্বাস দিলেন।

—কেন? এ রকম মনে হচ্ছে কেন?

—গুরুং সাহেব এখানে বেশ কয়েক বছর সার্কল অফিসার ছিলেন। সম্পার সঙ্গে খুব খাতির। মনে হচ্ছে সেই জন্যেই গুরুং সাহেবকে পাঠাচ্ছে।

—চলুন দেখি। ডাঃ চৌধুরীর গলায় খুব একটা ভরসা নেই।

—আমরাও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

দুপুরের মধ্যেই গ্রামে বেশ কিছু ছেলেকে ঘোরাফেরা করতে দেখে ওদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম

—খবর-টবর সব ভাল?

ও বলল—খবর পাও নি?

—কী।

—গুরুং সাহেব আসছেন। সম্পা রাস্তা খুলে দিতে বলেছে।

—বড়বাবুর মানুষ চেনার ক্ষমতা আছে। বললাম দাসবাবুকে।

—ঠিকই বলেছেন উনি। গুরুং সাহেবের সঙ্গে সম্পার দোস্তিই এতদিন পরে আলোচনার রাস্তা খুলে দিল।

—খুব ভাল খবর। ওদিক থেকে তোমাদের সবাই তাহলে চলে এসেছ। সি আর পি এফ-এর এলাকাটা দেখিয়ে বললাম।

—নাঃ। এখনই আসার কোন প্রশ্নই নেই। গুরুং সাহেব আসার পরে কী ফয়সালা হয় তা না দেখা পর্যন্ত আমরা ওদিকটা ঘিরেই রাখবো।

—কী মনে হয় তোমাদের? শেষ পর্যন্ত কী হবে? ওদের মতামত জানতে চাইলাম। ভেবেছিলাম এতদিন এদের মধ্যে থেকে কাজ করছি। আমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে ইতস্তত করবে না। বুঝতে ভুল হয়েছিল। এরা গেরিলা লড়াই করে। লড়াই সংক্রান্ত কোন কিছু অন্যের সঙ্গে আলোচনা আগেভাগে করবে না আমার বোঝা উচিত ছিল।



bengaliboi.com

ওদের মধ্যে ওয়াঙ্গু বলল—সম্পার যা হুকুম হবে আমাদের তাই করতে হবে। দেখা যাক কী হয়। বিচার তো একটা হবেই। গুরুং সাহেব আমাদের নিয়মকানুন ভালভাবেই জানেন। ওঁকে পাঠানোয় ভালই হল।

ইতিমধ্যে আকাশ জুড়ে কখন যেন ঘন কালো মেঘ জমে উঠেছে। নাগাল্যান্ডের দিক থেকে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমাদের গ্রামটার ওপরে ঝড়ের ঝাপটা সোজাসুজি এসে পড়ছে না। গ্রামগুলো এইরকম ভাবেই পাহাড়ের আড়ালে গড়ে তোলে।

দু'দিকের পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তার আওয়াজ পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। থেকে থেকে প্রাণ কাঁপানো শব্দে বাজ পড়ছে। বিদ্যুৎ-এর আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বোধ হয় আকাশ ভেঙ্গে পড়বে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবলভাবে নেমে এল বৃষ্টি। বৃষ্টি শুরু হওয়ায় ঝড়ের দাপট কিছুটা কমে গেল। কিন্তু বিদ্যুৎ চমকান আর বাজ পড়ায় কোন ছেদ পড়ল না। পুরো গ্রামের মধ্যে কালো মেঘ নেমে এল এক সময়। অন্ধকার হয়ে এল সমস্ত এলাকা।

আমাদের ডেরায় কয়েকজন ছেলে ছিল। কালুকে সকলের জন্যে চা করতে বললাম।

পাহাড়ের মধ্যে এই ধরনের তান্ডব যে কী ভয়ঙ্কর তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তার ওপরে যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি তাতে অতিবড় ডাকাবুকো লোকেরও বুঝিবা প্রাণে ভয় ধরে যাওয়ার জোগাড় হয়।

—লাল চায়ে চুমুক দিয়ে ওয়াঙ্গুকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই অবস্থায় ওদিকের ঘেরাও নিশ্চয়ই রাখতে পারবে না।

—না, ওরা কেউ চলে আসবে না। ঝড়-বৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকার জায়গাও আছে।

—কী বলছ কী? এই অবস্থায় কেউ বাইরে থাকতে পারে? দাসবাবু ওর কথা ঠিক মেনে না নিতে পেরে বললেন।

—না পারার কী আছে। এ রকম ঝড়-বৃষ্টি তো এখানে মাঝে মাঝেই হয়। আমাদের সবাই জানে এর থেকে কীভাবে আড়ালে থাকতে হয়। এদের জন্যে কোন চিন্তা নেই। আমি শুধু ভাবছি এই রকম প্রলয় চললে গুরুং সাহেব আসবেন কী করে।

ঝড়-বৃষ্টির দাপটে এই কথাটা এতক্ষণ খেয়াল করি নি। গুরুং সাহেব না এসে পৌঁছলে আবার পিছিয়ে যাবে আলোচনা। একটাই শুধু ভরসা। অরুণাচলের অন্য দিকের মতো এই অঞ্চলে পাহাড়ে ধ্বস নামে না। তবে ছোটখাট নদী নালার জলের স্রোতে অনেক সময় কাঠের পুরানো সেতু ভেঙ্গে যায়।

সে রকম কিছু হলে তো কয়েকদিন এই রকম অচলাবস্থা চলবে।

ভেবেছিলাম গুরুং সাহেব এসে কী করেন দেখবো। কিন্তু বাইরে যা পরিস্থিতি তাতে এখান থেকে বেরোনো একেবারেই সম্ভব নয়।

ঘড়ি দেখলাম। সাতটা বাজে মাত্র। মনে হচ্ছে মধ্য রাত্রি।

—আজকে একটু খিচুড়ি বানানো যাক। প্রস্তাব দিলেন দাসবাবু।

কালুর দ্বারা তো হবে না। আমিই চেষ্টা করে দেখছি। খিচুড়ির মধ্যে আলু দেবো, আর কিছু দরকার হবে না।



bengaliboi.com

উনি রান্নার জায়গায় চলে গেলেন। বাইরের ঝড়ের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কালুর পাম্পস্টোভের শোঁ শোঁ আওয়াজ মিশে গেল।

আমার মাথার মধ্যে তখন হাজারো চিন্তা ঢুকে পড়েছে। গুরুং সাহেব আজ না আসতে পারলে কাল নিশ্চয়ই আসবেন। কী আলোচনা হতে পারে সম্পার সঙ্গে? নৃতাত্ত্বিক হিসেবে আমার জানা দরকার।

যদি কোন রকম আপোস না হয়, তাহলে কতদিন এই রকম পরিস্থিতি চলবে? ঝামেলা আরো বেড়ে যাবে। হয়তো এদের সঙ্গে খোলাখুলি লড়াইও শুরু হয়ে যেতে পারে। যা কারুর পক্ষেই ভাল হবে না।

পুরো ব্যাপারটা এখন গুরুং সাহেব কী ভাববে হ্যান্ডেল করেন তার ওপর নির্ভর করছে।

বৃষ্টি একটু কমে আসতেই ছেলেগুলো চলে গেল।

যাওয়ার সময় বললাম—আজকে থাকবে না?

—না। এর বেশি কিছু বলল না।

ঘণ্টা খানেক পরে হাওয়ার জোর একেবারেই কমে এল। বৃষ্টি ঝির ঝির করে পড়ে চলেছে।

ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে আটটা বাজে। গুরুং সাহেবের আজ আর আসার কোন সম্ভাবনা নেই।

রোজকার ডায়েরি লিখতে বসলাম।

কতক্ষণ লিখেছি খেয়াল নেই। হঠাৎই কানে এল পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়ি চলার আওয়াজ।

ঘড়ি দেখলাম—ঠিক দশটা বাজে।

কান খাড়া করে শব্দটা ভাল করে শোনার চেষ্টা করলাম। দাসবাবুও শব্দটা শুনেছেন।

উনি আমার দিকে তাকালেন।

—গাড়ির আওয়াজ না? প্রশ্ন করলাম।

—তাই তো মনে হচ্ছে। আওয়াজটা তো এদিকেই আসছে বোধ হয়।

—এত রাতে গুরুং সাহেব আসছেন। স্বগতোক্তির মতো করলাম।

—চলুন তো বাইরে গিয়ে দেখি।

—বাইরে তখনো ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে।

ভিতর থেকে ছাতা নিয়ে এসে একটা ফাঁকা মতো জায়গায় দাঁড়ালাম। সেখান থেকে রাস্তা দেখা যায়।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি ভেদ করে গাড়ির হেড লাইটের আলো পাহাড়ের গায়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়ের আড়াল থেকে আলো কখনো বা আকাশের দিকেও উঠে যাচ্ছে। চড়াই-উতরাই রাস্তা পার হয়ে আসছে গাড়ি। একটানা যান্ত্রিক গোঁ গোঁ আওয়াজও পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধাক্কা খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—নিশ্চয়ই গুরুং সাহেব। চমকে উঠলাম পাশ থেকে কথা কটি শুনে।



bengaliboi.com

অন্ধকারে এতক্ষণ খেয়াল করি নি। ঠাহর করে দেখলাম—ওয়াঙ্গু। ওর সঙ্গে আরো চার-পাঁচ জন এসেছে।

—এই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তা থেকে গ্রামের মধ্যে আসবে কী করে? ওয়াঙ্গুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলেও আসলে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম।

—সম্পা তো নিচের ঘরেই আছে। গাড়ি থেকে নেমে সেখানে যেতে কোন অসুবিধে হবে না।

—একটু হতাশ হলাম। নিচের ঘরে মানে পাহাড়ের নিচে, গ্রামের শুরুতেই যে ঘর আছে সেইটা।

—ওখানে তো এখন যাওয়া উচিত হবে না। ভেবে ছিলাম মরুঙ-এ এলে গুরুং সাহেবের সঙ্গে সম্পার কী কথাবার্তা হয় তা শোনার সুযোগ পাব।

—হ্যাঁ, জিপই দেখা যাচ্ছে। দাসবাবু পাশ থেকে বললেন।

বৃষ্টি ভেজা গ্রাম জিপের আলোয় কিছুক্ষণের জন্যে ঝক ঝক করে উঠল।

গাড়ি সম্পার ঘরের কিছুটা ওপরে এসে থামল।

বৃষ্টির মধ্যে দেখতে কষ্ট হলেও গাড়ির আলো জ্বলছিল বলে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল। গাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক নামলেন। ছাতা মাথায় দিয়ে একাই সোজা সম্পার ঘরের দিকে ধীর পায়ে নেমে গেলেন। সঙ্গে কাউকে দেখলাম না। গুরুং সাহেব একান্তেই সম্পার সঙ্গে এখনই এক প্রস্থ আলোচনা করেই শুধু নিতে চান না, তাঁর গ্রামে এসে পৌঁছনোর সংবাদ নিজে গিয়ে সম্পাকে দিয়ে এদের চিরাচরিত প্রথা পালন করতে চান।

মনে মনে তারিফ করলাম গুরুং সাহেবকে।

এর পরে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও আর কিছু দেখতে পেলাম না। শুধু জিপের আশেপাশে দু-একজনকে মাঝে মাঝে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম। এতদূর থেকে আর কিছু এই রাতে জানা সম্ভব নয় দেখে মরুঙ-এ ফিরে এলাম।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে আবার গাড়ির আওয়াজ পেয়ে আন্দাজ করলাম, গুরুং সাহেব সম্পার ওখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই।

ঘুম ভাঙ্গল কালুর ডাকে। চা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কালকের জোলো হাওয়ায় শরীর কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। চোখ রগড়ে উঠে বসলাম। কালুর হাত থেকে চা নিয়ে ঘড়ি দেখলাম—ছটা বাজে।

হঠাৎই খেয়াল হল গুরুং সাহেবের কথা। ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হত। আমি ওঁদের আলোচনা শুনতে চাই, যদি ওঁদের সে রকম কোন অসুবিধে না থাকে।

মরুঙ-এর বাইরে বেরিয়ে এসে মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। কে বলবে কালকে দুপুর থেকে প্রায় প্রলয় হয়ে গেছে।

আকাশ ঝকমক করছে সূর্যের আলোয়। সকালের রোদে শীতের আমেজ জড়ানো। গ্রামের ঠিক উল্টোদিকে বসতি এলাকায় লোকজনের চলাচল শুরু হয়ে গেছে।



bengaliboi.com

স্থির করলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি হয়ে সম্পার ওখানে চলে যাবো। ওখানে গেলেই নিশ্চয়ই আলোচনার ব্যাপার জানতে পারবো।

তৈরি হয়ে বেরোনোর আগেই ওয়াঙ্গু এল। সাধারণত এই সময় ওরা কেউ আসে না।

ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলল—সার্কল অফিসে মিটিং হবে। সম্পা তোমাদের থাকতে বলেছে। তৈরি হয়ে নাও।

আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

সার্কল অফিসের বাইরে কতগুলো চেয়ার পাতা। মেগা গতকাল গুরুং সাহেবের সঙ্গে এসে গেছেন। আমাদের দেখে বললেন—আহ্‌ক্‌।

—কী হবে মিটিং-এ? প্রশ্ন করলেন দাসবাবু।

ঠিক মিটিং নয়। 'কেবাঙ' হবে। ক্যাপ্টেন-এর বিচার হবে বলতে পার।

—সে কী? এরা তো সিভিলিয়ান নয়। এদের বিচার কে করবে?

কথাটা শুনে মেগা একটু হাসলেন। বললেন দেখই না ব্যাপারটা কী হয়? গুরুং সাহেব তোমাদের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। যাবে নাকি দেখা করতে?

মনে মনে ঠিক এটাই চাইছিলাম। বললাম

—তোমাদের কেবাঙ-এর দেরি থাকলে চল।

তিন জন একটু দূরে গুরুং সাহেবের আস্তানায় হাজির হলাম।

মিঃ গুরুং বাইরে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসেছিলেন। মেগাকে দেখে বললেন—আহ্‌ক্‌।

আমাদের দুজনকে এক নজর ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন

—আপনারা তো নৃতাত্ত্বিক। তাই না? আপনাদের কথা কাল সম্পার কাছে শুনলাম।

—কতদিন আছেন এখানে?

—তা প্রায় দু'মাসের ওপরে হল।

শুনে বোধ হয় একটু আশ্চর্যই হলেন। আর একবার আমাদের ভাল করে দেখে বললেন—দু'মাস মরুঙে আছেন? অসুবিধে হচ্ছে না?

—গ্রামে থাকলে আমাদের কাজের পক্ষে অনেক সুবিধে হয়। শুধু চোখ কান খোলা থাকলেই অনেক কিছু জানা যায়। তাই একটু আধটু যে অসুবিধে হয়, তা ধর্তব্যের মধ্যে আনি না।

অ্যানথ্রপলজিস্টদের চোখ দিয়ে সবাই যদি এদের দেখার চেষ্টা করতো তাহলে বোধ হয় অনেক প্রবলেমই মিটে যেত।

গুরুং সাহেবের কথায় একটু খুশি হলাম বৈকি।

এর পরেই উনি যে প্রশ্নটি করলেন সেটা অনেকক্ষণ থেকেই আশা করছিলাম।

—এখানে যে ঘটনা ঘটে গেল তা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। এটা কী হওয়া উচিত ছিল?

এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবো? নৃতাত্ত্বিক হিসেবে আমার উত্তর নিশ্চয়ই 'না' হবে। সেটা হয়তো এদের পছন্দ নাও হতে পারে। সেই জন্যে প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি না দিয়ে বললাম



bengaliboi.com

—নৃতাত্ত্বিক হিসেবে আমি তো এই বিষয়ে আপনাদের মতামত জানতে চাইবো।

গুরুং সাহেব চায়ের আদেশ দিয়ে বললেন

—আমি তো বললামই যে ক্যাপ্টেনের জন্যে আজকের এই পরিস্থিতি তা কখনই হতো না, যদি এদের সমাজ সম্বন্ধে তার সামান্যতমও ধারণা থাকতো।

কথাটা একশ ভাগ ঠিক। তবু বললাম

—আমার ধারণা ছিল—এই ধরনের অফিসারদের যখন যেখানে পোস্টিং হয় তখন তাঁদের সেখানকার মানুষদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা বাধ্যতামূলক ব্যাপার।

—বাধ্যতামূলক নয়। তবে সকলের কাছ থেকে এটাই আশা করা যায়। কিন্তু আপনাদের লেখা তো আমরা পাইও না, আর পেলেও সব সময়ে আর কে তা পড়ছে। বেশি টেকনিক্যাল লেখা সব সময় পড়ার ধৈর্যও থাকে না। আপনারা সাধারণ মানুষের জন্যে সহজ করে লেখেন না কেন?

—আপনার অভিযোগ মেনে নিচ্ছি। বললাম আমি। তবে একেবারেই যে কেউ সাধারণ মানুষের বোঝার মতো করে লেখেন না তা নয়। তবে নিশ্চয়ই সংখ্যায় সেগুলি খুবই অল্প।

—আপনি তো শুনেছি বহু বছর এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কাটিয়েছেন। এদের খুব কাছ থেকে দেখেছেন। আপনার কোনদিন ইচ্ছে হয় না এদের নিয়ে লিখতে। পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

হাসলেন গুরুং সাহেব। বললেন—আমরা কী আপনাদের মতো নিরপেক্ষভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কোন সমাজকে দেখতে পারবো? আমাদের দেখা অনেকটাই হবে নিজেদের মানসিকতার রিফ্লেকশন।

এক মুহূর্তে গুরুং সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল দুগুণ। কী বিচক্ষণ কথা!

ইতিমধ্যে চা এসে গিয়েছিল। সঙ্গে বিস্কুট। চা পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই উঠে পড়লাম সার্কল অফিসে যাওয়ার জন্যে।

ইতিমধ্যে গ্রামের বেশ কিছু মানুষ হাজির হয়েছে সেখানে। উপস্থিত রয়েছেন ডাঃ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন রাও, স্কুল শিক্ষক বড়ুয়া। সকলের চোখে মুখেই একটা কৌতূহলের ছাপ। কিছুটা বা কঠিন পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়ার আকাঙ্খা।

আমরা যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সম্পাও এসে হাজির হল।

এই মানুষটির ওপরই বলতে গেলে সব কিছু নির্ভর করছে। বাইরে থেকে এর মনের অবস্থার সম্যক টের পাওয়া শক্ত। আর পাঁচটা সাধারণ দিনে যে রকম দেখেছি তার থেকে কোন ব্যতিক্রম দেখছি না।

গুরুং সাহেব আর সম্পা একে অন্যকে 'জয়হিন্দ' বলে সম্বোধন করে পাশাপাশি চেয়ারে বসলেন।

সম্পার চোখ দুটি উপস্থিত সবার ওপর দিয়ে একবার চলে গেল। আমাদের দেখে পাশে এসে বসার জন্যে ডাকল। গুরুং সাহেবও ডাকলেন।

আমি আর দাসবাবু মেগার পাশের চেয়ার দুটি টেনে নিলাম।

কাছ থেকে সম্পাকে আরো ভাল করে দেখলাম। এখন যেন মনে হল অন্য দিনের



bengaliboi.com

থেকে সম্পার চোয়াল একটু বেশি শক্ত। মনের ভিতরে বোধ হয় বেশ কিছু কঠিন চিন্তা-ভাবনা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গুরুং সাহেব মেগাকে বললেন—ক্যাপ্টেন সহায়কে আনতে বলেছেন তো?

—হ্যাঁ। মাথা নাড়লেন মেগা।

বলতে বলতেই দেখলাম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ক্যাপ্টেন নেমে আসছেন। পাশে দু তিন জন সি আর পি এফ-এর জওয়ান।

ক্যাপ্টেনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুঞ্জন উঠল উপস্থিত মানুষগুলির মধ্যে।

দু-একজন বোধ হয় অস্ফুটে কোন রকম গালাগালিও করল।

সঙ্গে সঙ্গে বকুনিও খেল সম্পার কাছে।

গুঞ্জন থেমে গেল এক লহমায়। কিন্তু গ্রামের মানুষের চোখে মুখে ঘৃণা ফুটে উঠছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আজকের ক্যাপ্টেনকে দেখে করুণা হওয়া ছাড়া উপায় নেই। বেচারা মাথা সোজা করে হাঁটতে পারছে না। চোখ মাটির দিকে। বোধ হয় এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এই অসভ্য মানুষগুলোর মাঝখানে তাকে জবাবদিহি কেন করতে হবে।

মনে পড়ে গেল সেদিন পড়ন্ত বিকেলে দেখা এই ক্যাপ্টেনকে। কী দোর্দণ্ড প্রতাপে সম্পার ভাইকে মারার আদেশ দিচ্ছিল। সেদিন এরই চোখে মুখে নিশ্চয়ই অসম্ভব রকমের হিংসার প্রতিফলন ফুটে উঠেছিল। সেদিনের থেকে আজকের এই ক্যাপ্টেনের কত তফাৎ। মনে হচ্ছে যেন এই কদিনেই বেশ কিছু বয়সও বেড়ে গেছে।

ক্যাপ্টেনকে দেখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠল গুরুং সাহেবের মুখে।

সম্পার চোখে মুখে কিন্তু কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম না।

হবে কেন? যে মানুষটা জীবনে চার জনের মাথা কেটেছে আর অনেক মাথা কেটে আলাদা চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। সেটা দেখিয়ে তাতে বসতে বললেন গুরুং [illegible]

অন্যদিকে সম্পার ভাই-এর বসার জায়গা।

গুরুং সাহেব সকলের উদ্দেশে বললেন—এবার আমাদের 'কেবাঙ' শুরু করছি।

প্রথমেই সম্পার ভাইকে বললেন

—তোমার কী বলার আছে বল।

সম্পা আমাদের যেভাবে ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছিল, প্রায় সেই কথাগুলোই থেমে থেমে বলল ও। কথাগুলো শোনর সময় গুরুং সাহেব থেকে থেকেই সহায়ের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ওনার মুখে অসম্ভব রকমের বিরক্তি আর রাগের আনাগোনা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলেন না। চেয়ারের মধ্যে কখনো সোজা হয়ে, কখনো বা ঝুঁকে, কাত হয়ে বসে রাগ সামলাতে চেষ্টা করছিলেন বোধ হয়।

সম্পার ভাই-এর কথা শোনার পর উনি ক্যাপ্টেন সহায়কে গম্ভীর ভারি স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন

—আপকা কুছ কহনা হ্যায়?



bengaliboi.com

—ম্যায় সমঝতা হুঁ যো কিয়া হুঁ উসমে কুছ গলতি নেহি হ্যায়।

কথাটা শুনে গুরুং সাহেব নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

—গলতি নেহি হ্যায়? ঠিক কিয়া? প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন তিনি।

আমরা ওনার ঠাণ্ডা মেজাজটাই এতক্ষণ দেখেছি। হঠাৎ এই হুঙ্কারে চমকে উঠলাম। আশেপাশে যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও নড়েচড়ে উঠল।

—আপকো ইঁহা পিটনেকো লিয়ে ভেজা গ্যা ক্যা? আপ ইনকে বারেমে ক্যা জানতে হ্যায়? গাঁওমে কিউ ঘুসা থা?

একটার পর একটা প্রশ্ন উড়ে গেল সহায়কে লক্ষ্য করে। গুরুং সাহেবের এই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখবে আশা করেন নি ক্যাপ্টেন। একটু থতমত খেয়ে গেলেন। তবু হাজার হলেও সি আর পি এফ-এর লোক। তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বললেন—উয়ো লোগ হামারা ক্যান্টিনমে ঝামেলা কর রহা থা।

এবার বলার ধরনটা বেশ নরম।

—তো ক্যা? কিছুতেই রাগ চাপতে পারলেন না গুরুং।

সম্পা কী বিনা পারমিশন সে আপ গাঁও মে ঘুস যায়েঙ্গে? ইসলিয়ে আপকো জো চাহে সাজা সম্পা দে সকতে হ্যায়। ম্যায় কুছ নেহি কর সকতা হুঁ। আপ ইনসে মাফি মাঙ লিজিয়ে।

এতক্ষণ পর্যন্ত সম্পা আশ্চর্যজনক ভাবে একটি কথাও না বলে চুপচাপ বসে থেকেছে। তার মুখচোখ সারাক্ষণ ছিল ভাবলেশহীন।

মাফ চাওয়ার কথা উঠতেই একটু সোজা হয়ে বসল। কিছু বলবে মনে হল, কিন্তু তার আগেই দু-তিন জন যুবক এক সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বলে উঠল—নেহি। মাফি সে নেহি হোগা।

সম্পা হাত তুলে ওদের থামিয়ে দিল। গুরুং সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল—ক্যাপ্টেন যদি আমার ছেলেদের তার এলাকায় পিটিয়ে মেরে ফেলত তাও আমার বলার কিছু ছিল না। ওদের এলাকায় যাওয়া ঠিক হয় নি। যদিও ওরা জওয়ানদের সঙ্গে মেলামেশা করে। তবু ক্যাপ্টেন যখন বলছেন ওদের এলাকায় গিয়ে ছেলেরা ঝামেলা করেছে তখন ওদের শাস্তি দিতেই পারে। কিন্তু আমার গ্রামে, আমার অনুমতি ছাড়া তো, আপনি জানেন, কেউ ঢুকতে পারে না। এতো রীতিমত আমাদের সমাজকে অবজ্ঞা করা। তারপরে সামনের সবাইকে দেখিয়ে বলল—এরা মনে করে ক্যাপ্টেন আমাকেও অপমান করেছে। সম্পাকে অপমান করার কোন ক্ষমা তো আমাদের নিয়মে নেই। এর একটাই শাস্তি ...। কথাটা শেষ না করেই থেমে গেল সম্পা।

সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল মৃত্যু শীতল নীরবতা। যুবকদের চোখ বোধ হয় উল্লাসে কিছুটা চকচক করে উঠল।

অসমাপ্ত কথার অর্থ বুঝতে গুরুং সাহেবের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। সম্পা ক্যাপ্টেনের মাথা নেওয়ার কথা বলতে চাইছে।



bengaliboi.com

—ধীর ভাবে মাথা নেড়ে সম্পাকে বললেন—না, তা হয় না। আমার এই আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তুমি ভাল করেই জানো। অন্য যা কিছু বলবে রাজি আছি। তোমরা হঠাৎ এই দাবি করছ কেন? তোমাদের এই প্রথাও তো অনেকদিন শেষ হয়ে গেছে।

সম্পা এর কোন উত্তর দিল না। নির্বিকারভাবে বলল—তা হলে যে রকম চলছে, সেই রকমই চলবে। ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ গলায় বলল—ওকে এখান থেকে আমরা যেতে দেব না। বাইরের কাউকে আসতেও দেব না। রাস্তা বন্ধ থাকবে।

সম্পার অনমনীয় ভাব দেখে গ্রামের মানুষ ছাড়া সবাই হতাশ হয়ে পড়ল।

আগের কথার খেই ধরে সম্পা বলল—এরা এখানে আছে। কী করতে পারবে যদি আমরা পাশের আন্ডার গ্রাউন্ড মানুষদের গ্রামে ঠাঁই দিই। পারবে তোমরা আমাদের থেকে তাদের আলাদা করে চিনে নিতে?

কিন্তু আমরা তা করছি না। কারণ আমরা তোমাদের আলাদা মনে করি না। গ্রামে গ্রামে সি আর পি এফ-এর জওয়ানদের থাকতে দিই। যদি আন্ডার গ্রাউন্ডদের আসতে দিই, এরা সব খতম হয়ে যাবে। আর এদেরই ক্যাপ্টেন কিনা আমার চোখের সামনে আমার গ্রামে ঢুকে, আমারই ছেলেদের লাঠি পেটা করল। কথাগুলো বলতে বলতে সম্পার গলার স্বর ধাপে ধাপে উঁচু হয়ে উঠল। মুখে ফুটে উঠল রাজ্যের বিরক্তি আর ঘৃণা।

একটু দম নিয়ে আবার বলল—ক'বছর আগে হলে তো এই কেবাঙ-এরও দরকার হত না। ওর মাথা নিয়ে আসতো গ্রামের ছেলেরা। না, আমি আমাদের নিয়ম ভাঙতে পারবো না।

ক্যাপ্টেন সহায়ের মাথা আরো ঝুঁকে, চিবুক প্রায় বুকের কাছে নেমে এসেছে ততক্ষণে।

গুরুং প্রায় অনুনয় করে বললেন—কিন্তু তোমরা তো জানো তোমাদের এই চরম শাস্তি এখন উঠে গেছে। মানছি ও অসাধারণ অন্যায় করেছে। কিন্তু এটাও ঠিক তোমাদের সমাজের নিয়ম সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকলে ও এটা নিশ্চয়ই করতো না। তোমাদের সকলের কাছে অনুরোধ করছি—এই চরম শাস্তি ছাড়া যা বলবে সেই সাজাই ওকে দেওয়া হবে। আমার মুখ চেয়ে রাজি হও। গুরুং সাহেব সম্পার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে মিনতি করলেন। ওনার মুখের দিকে তখন তাকানো যাচ্ছিল না। একটা অখণ্ড স্তব্ধতা নেমে এসে সবাইকে আচ্ছন্ন করে দিল।

সম্পার মুখের দিকে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করেই তাকিয়ে থাকল সবাই।

সম্পাও যেন এই পরিস্থিতিতে কী সিদ্ধান্ত নেবে ঠিক করতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে গ্রামের সবার দিকে দু একবার দেখলো। জানতে চাইল সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার উপায়।

—ঠিক আছে। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে হঠাৎই বলে উঠল ওয়াঙ্গু। ক্যাপ্টেনের উর্দির কাঁধে যে 'ফুল' আছে সেগুলো খুলে সম্পাকে দিতে হবে।

পাহাড়ে ধ্বস নামল যেন। ক্যাপ্টেনের ঝুঁকে পড়া মাথা, কথা কটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে গেল। মাথা সত্যি সত্যিই কাটা গেলেও বোধ হয় এতখানি অপমানিত হত



bengaliboi.com

না ক্যাপ্টেন। ইউনিফর্ম থেকে 'স্টার' খুলে নেওয়া আর সৈনিক জীবনে মৃত্যু হওয়া প্রায় এক হলেও তফাৎ আছে বৈকি।

সৈনিক জীবনে মৃত্যু তো হতেই পারে। সেটাতে সম্মানই বাড়ে। কিন্তু 'স্টার' খুলে নেওয়া তো অপমানের চূড়ান্ত। ওয়াঙ্গু যেন লুকোনো ল্যান্ডমাইন ফাটাল। কী অসাধারণ চতুর।

গুরুং সাহেব ভেসে যেতে যেতে হাতে খড়কুটো পেলেন যেন। বললেন—এটা তো মাথা নেওয়ার থেকেও বেশি শাস্তি হল ওর পক্ষে। আমি তো এই জবরদস্ত শাস্তিটা হলেই মনে করবো ও সারা জীবনের জন্যে কষ্ট পাবে।

সম্পা তুমি রাজি হয়ে যাও।

এতক্ষণ আমরা নীরব দর্শক হিসেবে সব দেখছিলাম। কেউ একটা কথাও বলি নি। পাশ থেকে এবার দাসবাবু ফিসফিস করে বললেন—সম্পা বোধ হয় রাজি হবে না। ওই স্টার তো এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েই ফিরিয়ে দিতে পারে।

কথাটা ঠিকই। তবু কেন জানি মনে হল সম্পা তার বন্ধুর মান রাখতে এই অচল অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে সব বুঝেও বোধ হয় রাজি হয়ে যাবে।

সম্পার মনে বোধ হয় এ রকমের শাস্তির কথা ঘুণাক্ষরেও উদয় হয় নি। বহুদিন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দোভাষীর কাজ করার জন্যে সেও এই শাস্তির অসাধারণ গুরুত্ব বোঝে। তাই বোধ হয় কিছুটা সপ্রশংস চোখে ওয়াঙ্গুর দিকে একবার তাকাল। পরে শান্ত গলায় অন্য সবাইকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করল—তোমরা কী বল?

কোন দরকার ছিল না মতামতের। কিন্তু শাস্তিটা যেহেতু একেবারেই নতুন ধরনের তাই বোধ হয় নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করার ঢঙে কথা কটি বলল।

এই শাস্তির গুরুত্ব জানে না বলে বেশিরভাগ লোকই। চুপ করে অনেকটা শূন্য দৃষ্টিতে সম্পার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। পরে বলল—তুমি যদি মনে কর যোগ্য শাস্তি হবে, তাহলে আমাদের আপত্তি হবে কেন?

সকাল থেকে যে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল তা কখন যেন এক সময় বন্ধ হয়ে গেছে খেয়ালই করি নি। আচমকা কোথা থেকে এক টুকরো বৃষ্টির মেঘ এসে এক পশলা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি দিয়ে গেল। সঙ্গে করে নিয়ে এল বন্ধ হয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা হাওয়া।

অরুণাচলে এরকম মাঝে মাঝেই হয়। মানুষ এখানে অভ্যস্ত। তাই কেউ উঠে গেল না। যে যেখানে ছিল সেখানেই থাকল। পরিস্থিতির কোন হেরফের হল না। শুধু একটা অচল অবস্থার থেকে বেরিয়ে আসার পথ পেয়ে আমাদের দম বন্ধ হওয়া ভাবটা ঠাণ্ডা হাওয়ায় মিশে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

ঝির ঝির বৃষ্টি আর শীত মাখানো হাওয়ায় বিরক্ত হওয়ার বদলে মনটা বেশ ফুরফুর করে উঠল।

অন্যদের মতো আমরাও অধীর আগ্রহে সম্পার রায় শোনার অপেক্ষায় থাকলাম।

সম্পা একবার আমাদের দিকে, আর একবার গুরুং সাহেবের দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলল



bengaliboi.com

—আপনারা জানেন ক্যাপ্টেন যে দোষ করেছেন তার কোন ক্ষমা আমাদের সমাজে নেই। আমরাও জানি আমাদের নিয়ম মতে আজকের দিনে এইভাবে কাউকে চরম শাস্তি দেওয়া সরকারি আইনে সম্ভব নয়। সব জেনেও আমি এই চরম শাস্তি চেয়েছি।

সম্পার কথা হঠাৎই থেমে গেল। আবার সেই দম বন্ধ করা জগদ্দল পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে এসে যেন চেপে বসল আমাদের ওপর।

গুরুং সাহেব একবার আমাদের দিকে আর একবার সম্পার দিকে হতাশ ভাবে তাকালেন।

আমাদের মতো মেগা, ডাঃ চৌধুরী আর বাকিদের অবস্থাও তথৈবচ।

সম্পা এবার ওয়াঙ্গুকে লক্ষ্য করে বেশ স্নেহ মেশানো স্বরে বলল

—ক্যাপ্টেনের মতো আপনাদের অনেকেই আমাদের অসভ্য নেংটি পরা মানুষ ছাড়া কিছু মনে করেন না। কিন্তু আজকে ওয়াঙ্গু যে শাস্তির কথা বলল তা কী আপনাদের মতো লেখাপড়া জানা সভ্য মানুষের বুদ্ধির থেকে কোন অংশে কম?

সম্পার গলার স্বরে গর্বের ছোঁয়া। একটু আগের সেই কঠোর কঠিন মুখ অনেকখানি হালকা দেখাচ্ছে। দু'চার ফোঁটা বৃষ্টির কণা লেগে তা যেন আরো নরম হয়ে উঠেছে।

আবার এক ঝলক আসা ঠাণ্ডা হাওয়া সকলের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। সম্পার পরের কথাগুলো শোনার জন্যে একটু ভাল করে বসলাম।

গুরুং সাহেব বললেন—কম কী বলছ? ওতো আমাদের সবাইকে টেক্কা দিল।

সম্পা এবার দরাজ গলায় বলল—আমি আপনাদের সবার সম্মানে ওয়াঙ্গুর কথা মেনে নিচ্ছি। সবার সামনে গুরুং সাহেব যদি ক্যাপ্টেনের উর্দি থেকে 'ফুল'গুলো খুলে আমার হাতে দেন তাহলে ওকে আমরা এখান থেকে চলে যেতে বাধা দেব না।

ক্যাপ্টেন সহায় অসহায় চোখে গুরুং সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন। কাকুতি ভরা চোখে এই শাস্তি মেনে না নেওয়ার অনুরোধ করার চেষ্টা করলেন।

কাল বিলম্ব না করে গুরুং সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে ইউনিফর্মের দু'কাঁধের দিক থেকে একটি একটি করে 'স্টার' খুলে সম্পার হাতে দিলেন। গ্রামের সকলের চোখে চাপা উল্লাস ছড়িয়ে পড়ল। আচমকা সমস্ত পাহাড় কাঁপিয়ে সবাই মিলে যুদ্ধজয়ের আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

উঃ, সে কি ভয়ঙ্কর রক্ত জল করা আওয়াজ। মুহূর্তে যেন আমাদের সবার রক্তচাপ তলানিতে গিয়ে ঠেকল। হাত-পা সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে সেই আওয়াজ যখন অনেকটাই নরম হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে এল তখন সম্বিত ফিরে পেয়ে সম্পার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। সম্পার চোখেও যেন বহুদিনের পুরানো নরমুণ্ড শিকারের পরিতৃপ্তি ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে।

ক্যাপ্টেন সহায়ের জন্যে খুব খারাপ লাগল। স্পষ্ট দেখলাম—লজ্জায় অপমানে ওঁর সমস্ত মুখ কেমন রক্তহীন হয়ে পড়েছে। চোখের কোণে চিকচিক করছে জল।

স্টারগুলো খোলার পরে গুরুং সাহেব সম্পাকে বললেন—তোমাদের এই উদারতার কথা আমরা সবাই চিরকাল মনে রাখব। ব্যক্তিগতভাবে আমি পুরানো বন্ধু হিসেবে তোমার



bengaliboi.com

কাছে কৃতজ্ঞ। এইবার যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি ক্যাপ্টেনকে নিয়ে এখনই বেরিয়ে যাই।

গুরুং সাহেবের হাবভাবে মনে হল যত তাড়াতাড়ি পারেন ক্যাপ্টেনকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চান। কোন সুযোগ দিতে চান না পরিস্থিতি আবার ঘোরালো হতে।

সম্পা কিছু বলার আগেই সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল—নিয়ে যাও, এক্ষুনি নিয়ে যাও।

সকলের মতন সম্পারও যে একই মত তা বোঝানোর জন্যে সম্পা চেয়ার থেকে উঠে গুরুং সাহেবের দুটি হাত অল্পক্ষণের জন্যে ধরে ছেড়ে দিল।

ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে নিয়ে গুরুং সাহেব তাঁর গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ওঁকে গাড়িতে তুলে দিয়ে সকলের উদ্দেশে হাত নাড়লেন।

গাড়ি মৃদু শব্দ করেই চলতে আরম্ভ করল। কয়েক দিনের দুঃস্বপ্ন যেন সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে হারিয়ে গেল। পাহাড়ের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়া ইঞ্জিনের একটানা গোঁ গোঁ শব্দ ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যেতে লাগল। পিছনে রেখে গেল এমন একটি সমাজের মানুষ যারা এই অল্প কিছুক্ষণ আগে তাদের চিরাচরিত অতি প্রাচীন একটি সামাজিক প্রথা আঁকড়ে না থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিজেরাই কী সুন্দরভাবে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে অসাধারণ পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

বৃষ্টিটা এবার বেশ একটু জোরেই এল।

—চলুন। দাসবাবুর ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। সবাই প্রায় চলে যাওয়ার মুখে। সম্পা তার ছ'ফুটের ওপর লম্বা শরীরটা নিয়ে ভিজতে ভিজতেই ধীরে ধীরে শক্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

একটু দূরে ওয়াঙ্গুর কাছে গিয়ে ওর দু'কাঁধে হাত রেখে দাঁড়াল অল্পক্ষণ। বিড়বিড় করে কিছু বলল বোধ হয়। বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দে শুনতে পেলাম না কিছু।

হয়তো সাবাসি দিল, হয়তো বা অন্য কিছু।

কল্পনা করতে ইচ্ছে হল সম্পার চোখ দুটির অপলক চাউনি নিঃশব্দে বলছে

—এইভাবেই তোমাদের মধ্যে দিয়ে আমাদের সংস্কৃতি চিরাচরিত গন্ডির বাইরে বেরিয়ে এসে আরো সামনে এগিয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে না আমাদের সমাজ। আজ আমি বড় নিশ্চিন্ত রে।

ওয়াঙ্গুর কাঁধ থেকে হাত দুটি নামিয়ে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কেমন যেন ঘোরের মধ্যে কোন দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে পাহাড়ের ঢালে নেমে গেল সম্পার দীর্ঘ শরীর।

পিছনে পিছনে গেল ওয়াঙ্গু আর তার সঙ্গীরা।

শুধু একটি ঐতিহাসিক বিচারের সাক্ষী হয়ে স্থানুর মতো পিছনে দাঁড়িয়ে শীতের বৃষ্টিতে ভিজতে থাকলাম আমরা দুজন।

---

bengaliboi.com